মাসিক
# পৃথিবী
ইসলামী গবেষণা পত্রিকা

সেপ্টেম্বর ২০২৫
ভাদ্র-আশ্বিন ১৪৩২
রবিউল আউয়াল-রবিউস সানি ১৪৪৭
বর্ষ ৪৪
সংখ্যা ১২

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক : ড. মো: ছামিউল হক ফারুকী

## সূচীপত্র

**সম্পাদকীয়** ॥ ৩
**দারসুল কুরআন**
মু'মিনগণের কতিপয় বৈশিষ্ট্য
প্রফেসর শাইখ ড. মুহাম্মাদ আব্দুস সামাদ ॥ ৫
**দারসুল হাদীস** ॥
সহনশীলতা : মানবজীবনের একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য
অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ছাইদুল হক ॥ ১৫
**চিন্তাধারা**
বাংলাদেশের নিরাপত্তা
আবুল আসাদ ॥ ২২
নারী নির্যাতনের বিভিন্ন রূপ: ইসলামে তার প্রতিকার
ড. মো: ছামিউল হক ফারুকী ॥ ৩১
রাসূলুল্লাহ সা. এর ক্ষমা ও  উদারতা
ড. মুহাম্মদ শাহিদুল ইসলাম ॥॥ ৪১
**আন্তর্জাতিক**
ইসরায়েলী নৃশংসতা ও গাজার যুদ্ধ
মীযানুল করিম ॥ ৫১
**প্রশ্নোত্তর** ॥ ৫৭
**বই পরিচিতি**
মুহাম্মদ খলিলুর রহমান মুমিন ॥ ৬১

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২৩০ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১২০৫-এর পক্ষে ড. মো: ছামিউল হক ফারুকী কর্তৃক প্রকাশিত এবং আলফালাহ প্রিন্টিং প্রেস, ৪২৩ এলিফ্যান্ট রোড, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭ থেকে মুদ্রিত।

**যোগাযোগ :**

**সম্পাদকীয় বিভাগ :** ২৩০ নিউ এলিফ্যান্ট রোড (৪র্থ তলা),  ঢাকা-১২০৫
**সেলস্ এন্ড সার্কুলেশান :** কাঁটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস, ঢাকা-১০০০; ফোন : ০১৫৭৫৬২২০৮৫, ০১৬১২৯৫৩৬৭০, ০১৭৩২৯৫৩৬৭০
৩৪/১ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০, ফোন :  ০১৭৪১৬৭৭৩৯৯
Web : www.dhakabic.com, E-mail : dhakabic@gmail.com

ISSN : 1815-3925

**মূল্য : পঞ্চাশ টাকা**

# মাসিক পৃথিবী'র নিয়মাবলী

**১. এজেন্সী**

- ✳ প্রতি কপি পত্রিকার গায়ের মূল্য ৫০ টাকা।
- ✳ সর্বনিম্ন পাঁচ কপির এজেন্সী দেয়া হয়।
- ✳ এজেন্সীর জন্য অগ্রিম টাকা দিতে হয়।
- ✳ কোনো জামানত রাখতে হয় না।
- ✳ অর্ডার পেলেই পত্রিকা ডাক ও কুরিয়ার যোগে পাঠানো হয়।
- ✳ যে কোন মাস থেকে পত্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করা যায়।
- ✳ অবিক্রিত কপি ফেরত নেয়া হয় না।
- ✳ ৫ কপি থেকে ২৫ কপির জন্য ২৫% কমিশন দেয়া হয়।
- ✳ ২৬ কপি থেকে ১০০ কপির জন্য ৩০% কমিশন দেয়া হয়।

**বিভিন্ন দেশে প্রতি কপি পত্রিকা পাঠানোর বার্ষিক ডাক খরচ**

| দেশের নাম | সাধারণ ডাক খরচ | রেজিঃ ডাক খরচ |
|---|---|---|
| ✳ বাংলাদেশ | ৭০০/- | ৭০০/- |
| ✳ ভারত, পাকিস্তান ও নেপাল | ১৩৫০/- | ১৬০০/- |
| ✳ মধ্যপ্রাচ্য, এশিয়া | ১৬০০/- | ১৯০০/- |
| ✳ আফ্রিকা, ইউরোপ | ২৬০০/- | ২৮০০/- |
| ✳ আমেরিকা, ওশেনিয়া | ২৮০০/- | ২৯০০/- |

**২. টাকা পাঠানোর নিয়ম**

- ✳ গ্রাহক হবার জন্য মানি অর্ডার/চেক/ব্যাংক ড্রাফট- 'মেসার্স পৃথিবী' হিসাব নং-১০৮৫, এম.এস.এ (ইসলামী ব্যাংক, এলিফ্যান্ট রোড শাখা, ঢাকা)-এই নামে অগ্রিম পাঠাতে হয়। অথবা-
- ✳ ০১৭৩২-৯৫৩৬৭০ নাম্বারে বিকাশ মার্চেন্ট পেমেন্ট করা যায়।
- ✳ পত্রিকা বৃদ্ধি করা/কমানো বা পত্রিকার বিল সংক্রান্ত যে কোন বিষয়ে যোগাযোগ করুন : ০১৫৭৫৬২২০৮৫


**ম্যানেজার**

সেল্‌স এন্ড সার্কুলেশন বিভাগ

**বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার**

**২৩০ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা।**

ফোন ঃ ০১৬১২৯৫৩৬৭০, ০১৭৩২৯৫৩৬৭০

৩৪/১ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০, ফোন: ০১৭৪১৬৭৭৩৯৯

Web: www.dhakabic.com, E-mail : dhakabic@gmail.com

# মুহাম্মাদ (সা.) এর আদর্শই মানবতার মুক্তির উপায়

আরবী বর্ষে রবিউল আউয়াল একটি গুরুত্বপূর্ণ মাস। এ মাসেই মানবতার বন্ধু বিশ্বমানবতার মুক্তিদূত, মানবতার মহান শিক্ষক, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছিলেন। আবার বিশ্ববাসীকে কাঁদিয়ে এ মাসেই তিনি এই পৃথিবী ছেড়ে মহান প্রভু আল্লাহর সান্নিধ্যে চলে গিয়েছিলেন। এ কারণেই রবিউল আউয়াল মাস একদিকে হর্ষের অন্যদিকে বিষাদের।

তিনি পৃথিবী ছেড়ে চলে গেলেও মানবতার মুক্তির জন্য তিনি যে আদর্শ নিয়ে এসেছিলেন তা বর্তমান রয়েছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে। সে আদর্শ হলো ইসলাম, যার সবকিছু আল কুরআন ও সুন্নাহতে বিদ্যমান রয়েছে। সেটির অনুসরণ করলে তার অবর্তমানেও মানুষ সেটির সুফল ভোগ করতে পারবে। বিদায় হজের ঐতিহাসিক ভাষণে তিনি সে কথাটিই বিশ্ববাসীর কাছে স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন। তিনি বলেছেন, "আমি তোমাদের মাঝে দু'টি জিনিস রেখে গেলাম, যতদিন তোমরা সে দু'টি আঁকড়ে ধরে থাকবে ততদিন পথভ্রষ্ট হবে না।"

মানুষের মুক্তির জন্য মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইসলামী আদর্শ পরিপূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। আদর্শের কখনো মৃত্যু হয় না। তাই তাঁর আনীত আদর্শ কিয়ামত পর্যন্ত টিকে থাকবে এবং এ আদর্শের মাঝেই তিনি পৃথিবীবাসীর নিকট অমর হয়ে থাকবেন। অন্যান্য মানুষের মতো মহামানবগণও মরণশীল। তাই তাঁদেরও মৃত্যু হয়। কিন্তু তাঁরা মৃত্যুবরণ করলেও তাঁদেরকে অনুসরণ করা ও ভালোবাসার পরিসমাপ্তি ঘটে না। আদর্শের অনুসরণের মাধ্যমেই তাঁদেরকে অনুসরণ করা ও ভালোবাসা যায়। এ কথাটি মহান আল্লাহ ঘোষণা করেছেন এভাবে,

"হে নবী, তুমি বলে দাও, তোমরা যদি আল্লাহকে ভালবেসে থাকো, তাহলে আমার অনুসরণ করে চলো। তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দেবেন। আর আল্লাহ হচ্ছেন ক্ষমাশীল করুণাময়।" (৩ : সূরা আলে ইমরান-৩১)।

মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কেউ ঈমানদার হতে পারবেনা, যতক্ষণ না তার প্রবৃত্তি আমি যা নিয়ে এসেছি তার পূর্ণ অনুগত হয়। সুতরাং তিনি যে আদর্শ পৃথিবীতে বাস্তবায়িত ও প্রতিষ্ঠিত করে রেখে গিয়েছেন, তা বাস্তবায়ন করা ও প্রতিষ্ঠিত রাখাই তাকে ভালোবাসা ও অনুসরণ করার নামান্তর। তা না করে শুধু ভালো ভালো বক্তব্য দেওয়া কথা ও কাজের গড়মিল তথা মুনাফিকির শামিল। আর আল্লাহ তা'আলা এটিকে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন, "হে ঈমানদারগণ,

তোমরা এমন কথা কেন বল যা কার্যে পরিণত করো না? তোমরা যা করো না তা বলবে এটা আল্লাহর নিকট মহাপাপ।" (৬১ : সূরা আস সাফ্ : ২-৩)।

সুতরাং মহানবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনী, সিরাত প্রভৃতি শুধুমাত্র আনুষ্ঠানিক আলোচনার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না। বরং তাঁর আদর্শের আলোকে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র প্রভৃতি পরিচালনার ব্যবস্থা করতে হবে।

আদর্শ যত সুন্দর ও পরিপূর্ণই হোক, তা সমাজে বাস্তবায়িত না থাকলে সে আদর্শের কল্যাণ পাওয়া সম্ভব নয়। সেজন্য ইসলামী আদর্শের কল্যাণ সকলের নিকট পৌঁছাতে হলে সর্বত্র ইসলামী বিধান বাস্তবায়ন করা জরুরী।

কিন্তু দুঃখের বিষয় প্রতিবছর রবিউল আউয়াল মাস এলে আমরা তা সাড়ম্বরে পালন করি। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনী, তাঁর জীবনের বিভিন্ন দিক আলোচনা করি। কিন্তু সেগুলো সমাজ, রাষ্ট্রে বাস্তবায়নের কোন উদ্যোগ গ্রহণ করি না। যে আদর্শ বাস্তবায়নের জন্য মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম রক্ত ঝরিয়েছিলেন, তাঁর পবিত্র দাঁত শহীদ করেছিলেন, অকথ্য নির্যাতন সহ্য করেছিলেন, এমনকি নিজের দেশ, আত্মীয়-স্বজন প্রভৃতি পরিত্যাগ করে মদিনায় চলে গিয়েছিলেন। আমরা সেই আদর্শের ধারক বাহকের দাবিদার হয়ে শুধু আলোচনার টেবিলে আলোচনা করে দায়িত্ব শেষ করলে হবে না। বরং আমাদের দায়িত্ব হল সার্বিক উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে ইসলামী আদর্শকে সমাজে বাস্তবায়িত করা। এজন্য যত ঝুঁকি নেওয়া দরকার তা নিতে হবে, এমন কি সে জন্য জীবন উৎসর্গ করার প্রয়োজন হলে তাও করতে হবে। এটিই ঈমানের দাবি। ■


# "মাসিক পৃথিবী"

## নিজে পড়ুন, অন্যকে পড়তে উৎসাহিত

# মু'মিনগণের কতিপয় বৈশিষ্ট্য

أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

{الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ}

**অনুবাদঃ** 'যারা গায়েবের প্রতি ঈমান আনে আর সালাত কায়েম করে এবং আমরা যে রিযক তাদেরকে দান করেছি তা থেকে ব্যয় করে। আর যা আপনার প্রতি নাযিল করা হয়েছে এবং যা আপনার পূর্বে নাযিল করা হয়েছে তার প্রতি তারা ঈমান পোষণ করে। আর তারা আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস পোষণ করে', [আল-বাকারাহ-২: ৩- ৪]।

**নামকরণঃ** সূরাটির ৬৭, ৬৮ ও ৬৯ নং আয়াতে উল্লেখিত 'বাকারাহ' শব্দটিকেই সূরাটির নাম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। বাকারাহ অর্থ গাভী। অর্থাৎ এ সূরাটিতে বানূ ইসরাঈলের সাথে সংশ্লিষ্ট গাভীর কাহিনী তুলে ধরা হয়েছে।

**নাযিলের সময়কালঃ** সর্বসম্মত মতানুযায়ী সূরাটি মাদীনায় নাযিল হওয়া একটি সূরা, [তাফসীর ইবন কাসীর ১/১৫৫]।

**ব্যাখ্যা ও সংক্ষিপ্ত তাফসীরঃ** আয়াত দু'টি আল বাকারার একেবারেই প্রথম দিকের। এর পূর্বের আয়াতে আল্লাহ তা'আলা আল-কুরআনের পরিচয় দিয়ে বলেছেন, এটি একটি কিতাব, যা মুত্তাকীদের হিদায়াতের গ্রন্থ। তারপরই মু'মিন- মুত্তাকীদের কিছু বৈশিষ্ট ও পরিচিতি তুলে ধরা হয়েছে। এভাবে আল কুরআন ও আস্ সুন্নাহতে মু'মিনগণের অনেক বৈশিষ্ট ও গুণাগুণের কথা তুলে ধরা হয়েছে। যেমন;

**এক.** আলোচ্য আয়াত দু'টিতে গায়েব ও অদৃশ্যমান বিষয়ের প্রতি ঈমান পোষণ করা ও সেগুলোর সত্যতার স্বীকৃতি দেয়া প্রকৃত মু'মিনগণের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট। মহান আল্লাহ বলেন, **الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ 'যারা গায়েবের প্রতি ঈমান এনেছে',**। 'ঈমান' শব্দটির অর্থ বিশ্বাস করা। পরিভাষায় ঈমান হচ্ছে কতিপয় মৌলিক বিষয়ের উপর প্রকৃত বিশ্বাস স্থাপন করা। এ জন্য ঈমান কোন আশা- আকাঙ্খার বিষয় নয় বরং ঈমান হচ্ছে, অন্তরে যে বিশ্বাস গভীর ও দৃঢ়ভাবে জায়গা করে নেয়, মুখেও স্পষ্ট করে ঘোষণা দেয় আর তার বাস্তব কার্যক্রম তার মনের বিশ্বাস ও মুখের ঘোষণাকে সত্যে পরিণত করে। এ কারণে মৌখিকভাবে 'আমি মু'মিন' বা 'আমি একত্ববাদী' এ দাবীর নাম 'ঈমান'

নয়। বরং ঈমান হচ্ছে, অন্তরের বিশ্বাস, মুখের স্বীকৃতি এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা বাস্তবে কর্ম সম্পাদনের নাম।

ঈমান হলো, ঈমানের মৌলিক ভিত্তিগুলোর (আরকানুল ঈমান) উপর বিশ্বাস স্থাপন করা, যে বিষয়গুলো 'উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বর্ণিত হাদীসে জিবরীলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, ঈমান হলো,

أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ، وَمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ،

'তোমার আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফেরেশতাকুলের প্রতি, তাঁর কিতাবসমূহের প্রতি, তাঁর রাসূলগণের প্রতি আর পরকালের প্রতি এবং ভাল ও মন্দ যাই হোক তা ভাগ্যের মাধ্যমে হয় এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা', [সাহীহ মুসলিম ১/৩৭, নং ৮]। আলোচ্য আয়াতে গায়েব ও পরকালের প্রতি বিশ্বাসের কথা বলা হয়েছে।

তাছাড়াও ঈমান শুধু কতিপয় মৌলিক ভিত্তিগুলোর প্রতি বিশ্বাস করার নামই নয় বরং ঈমানের সাথে কর্মের এমন সংশ্লিষ্টতা রয়েছে যে, একটা থেকে আরেকটাকে পৃথক করার কোন সুযোগ নেই। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ}

'আর যারা ঈমান এনেছে আর সৎকর্ম সম্পন্ন করেছে, ওরাই তো জান্নাতের অধিবাসী, যাতে তারা স্থায়ীভাবে থাকবে', [আল-বাকারাহ- ২: ৮২]। আল্লাহ সুবহানাহু আর বলেন,

{إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ}

'নিশ্চয় যারা ঈমান পোষণ করেছে এবং সৎকর্ম করেছে। তাদের রব তাদেরকে তাদের ঈমানের কারণে হিদায়াত দান করবেন। নি'য়ামতে ভরপুর জান্নাতে তাদের নিচ দিয়ে নানা নদ-নদী প্রবাহিত হবে', [ইউনুস- ১০: ৯]। আল্লাহ তা'আলা আর বলেন,

{إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا}

'নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে, তাদের জন্য ফিরদাউস জান্নাতে আতিথেয়তা রয়েছে', [আল- কাহ্‌ফ- ১৮: ১০৭]। এসব আয়াতে ঈমানের সাথে সাথে 'আমলের কথাও বলা হয়েছে, তারপর তাদের পুরস্কারের কথা তুলে ধরা হয়েছে।

আর غَيْب এর অর্থ হচ্ছে, যা মানুষের জ্ঞানের উর্ধ্বে এবং যা মানুষ ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভব করতে পারে না। আল-কুরআনে غَيْب শব্দ দ্বারা ঐ সব বিষয়কে বুঝানো হয়েছে, যেগুলোর সংবাদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম দিয়েছেন। এসব অদৃশ্য বিষয়ের মধ্যে আল্লাহর অস্তিত্ব, সত্তা, গুণাবলী, তাকদীর সম্পর্কিত বিষয়াবলী, জান্নাত-জাহান্নামের অবস্থা ও কিয়ামাত এবং এ সম্পর্কিত ঘটনাবলী, ফেরেশতাকুল ইত্যাদি বুঝানো হয়েছে। ঈমান বিল গায়েব সম্পর্কে 'আব্দুল্লাহ ইবন মাস'উদ (রা) বলেন, গায়েবের বিষয়াদির উপর ঈমান আনার চেয়ে উত্তম ঈমান আর কারও হতে পারে না।

তারপর তিনি সূরা বাকারার প্রথম ৫টি আয়াত তিলাওয়াত করেন', [আল- হাকিম, আল- মুস্তাদরাক ২/২৮৭, নং ৩০৩৩]।

**মহান আল্লাহর বাণী,** وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ **'আর সালাত কায়েম করে এবং আমরা যে রিযক তাদেরকে দান করেছি তা থেকে ব্যয় করে**। 'সালাত' শব্দটির অর্থ হচ্ছে, দু'আ। শারী'আতের পরিভাষায় একটি বিশেষ 'ইবাদাত। আল কুরআনে যতবার সালাতের নির্দেশ দেয়া হয়েছে, সাধারণতঃ দু' এক স্থান ব্যতীত 'ইকামাত' শব্দের দ্বারাই দেয়া হয়েছে। ইকামাত শব্দের অর্থ সোজা করা, স্থায়ী রাখা। আল কুরআন ও আস সুন্নাহর পরিভাষায় 'ইকামাতুস সালাত' অর্থ, নির্ধারিত সময় অনুসারে যাবতীয় শর্তাদি ও নিয়মাবলী রক্ষা করে সালাত আদায় করা। সালাতের যত গুণাবলী, ফলাফল লাভ ও বরকতের কথা কুরআন কারীম ও সাহীহ হাদীসে বর্ণনা করা হয়েছে, তা সবই ইকামাতুস সালাত (সালাত প্রতিষ্ঠা) এর সাথে সম্পর্কযুক্ত। সালাতের যাবতীয় ফারয, ওয়াজিব, সুন্নাহ, মুস্তাহাব, রুকু, সাজদাহ, তিলাওয়াত খুশু', সালাতে অভ্যস্ত হওয়া, জামা'আতের সাথে হওয়া। সালাত বাস্তাবায়নের জন্য সকল ক্ষমতা প্রয়োগ করা, রাষ্ট্রীয়ভাবে তদারকির ব্যবস্থা ইত্যাদিকে শামিল করে, [তাফসীর ইবন কাসীর ১/৬৮, ফাতহুল কাদীর ১/৪২, কুরআনুল কারীম, বাংলা অনুবাদ ১/২৪]। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাসীনদের অন্যতম কাজ হচ্ছে, সালাত কায়েম করা, যাকাত আদায় করা, সৎকাজের নির্দেশ দেয়া এবং অসৎ কাজের নিষেধ করা, [আল–হাজ্জ: ৪১]।

**আল্লাহ তা'আলার বাণী,** وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ **'আমরা তাদের যে রিযক দিয়েছি তা থেকে তারা ব্যয় করে'**, এর অর্থ এখানে ফারয যাকাত, ওয়াজিব সাদকা এবং নফল দান প্রভৃতি, যা আল্লাহর পথে ব্যয় করা হয়, সেসব কিছুকেই বুঝানো হয়েছে। [তাফসীরুত তাবারী ১/২৪৩, ফাতহুল কাদীর ১/৪২, আদওয়াউল বায়ান ১/১২]।

**মহান আল্লাহর বাণী,** وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ **'আর যা আপনার প্রতি নাযিল করা হয়েছে এবং যা আপনার পূর্বে নাযিল করা হয়েছে তার প্রতি তারা ঈমান পোষণ করে'**। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে মু'মিন ও মুত্তাকী দুই শ্রেণীর লোক বিদ্যমান ছিলেন। এক শ্রেণী, যারা প্রথমে মুশরিক ছিল পরে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। আরেক দল যারা আহল কিতা – ইহুদী ও নাসারা ছিল এবং পরে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। পূর্ববর্তী আয়াতে প্রথম শ্রেণীর বর্ণনা ছিল। পরের আয়াতে দ্বিতীয় শ্রেণীর বর্ণনা দেয়া হয়েছে। তাই আয়াতে কুরআনের প্রতি ঈমান আনার সাথে সাথে পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহে বিশ্বাস করার কথা বলা হয়েছে। হাদীসের আলোকে যারা পূর্বের আসমানী কিতাবে বিশ্বাসী ছিলেন তারা কুরআনের প্রতি এবং পূর্বের কিতাবসমূহের অনুসারী হওয়ার কারণে দ্বিগুণ পুণ্যের অধিকারী হবেন, [সাহীহুল বুখারী ৪/৬০, নং ৩০১১, সাহীহ মুসলিম ১/১৩৪, নং ১৫৪, ইবন কাসীর ১/১৭০]।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ **'আর তারা আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস করে'**,। এটি মুত্তাকীদের আরেকটি গুণ। তারা আখিরাতের প্রতি নিশ্চিত বিশ্বাস রাখে। যেসব বিষয়ের প্রতি ঈমান আনতে হয় তন্মধ্যে আখিরাতের প্রতি ঈমান পোষণ

করা অন্যতম। বস্তুতঃ মু'মিনগণ এ বিশ্বাসে উদ্বুদ্ধ হয়ে কাজে কর্মে ও নৈতিকতায় এবং ব্যক্তিগত, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় এমনকি সার্বিক জীবন পর্যন্ত দুনিয়ার অন্যান্য সকল জাতির মোকাবেলায় একটি বৈশিষ্টপূর্ণ অবস্থানে উত্তীর্ণ হয়। এ জন্যে সকল নাবী– রাসূল তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতের প্রতি বিশ্বাসের দিকে মানব জাতিকে বিশেষ ভাবে দা'ওয়াত দিয়েছেন। আখিরাতের প্রতি বিশ্বাসের অর্থ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে আখিরাতের যে বর্ণনা ও যেসব বিষয় সংঘটিত হবে বলে তথ্য দেয়া হয়েছে, সেসব বিষয়কেই বিশ্বাস করা। এটি মূলতঃ তিনটি বিষয়কে শামিল করে; (১) শিংগায় ফুৎকারের মাধ্যমে মৃতদেরকে জীবিত করা। তখন লোকেরা মহান রবের সামনে খালি পা, বিবস্ত্র ও খাতনাবিহীন অবস্থায় দাঁড়াবে, বিশ্বাস করা। (২) হিসাব ও প্রতিদান দেয়ার উপর ঈমান আনা। বান্দার হিসাব হবে এবং তার 'আমলের উপর তাকে পুরস্কৃত করা হবে অথবা শাস্তি প্রদান করা হবে। (৩) জান্নাত ও জাহান্নামের উপর ঈমান আনা। জান্নাত ও জাহান্নামকে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং দু'টা কখনো নিঃশেষ হবে না। এ দুটোই মানুষের স্থায়ী ঠিকানা। এ তিনটির সাথে পরকালে সংঘটিত সব বিষয়ই অন্তর্ভূক্ত হবে। যেমন, বারযাখী জীবন, কবরের প্রশ্নোত্তর, কবরের সুখ ও শাস্তি, ওযন, মীযান, সিরাত, শাফা'য়াত ইত্যাদি, [ফাতহুল কাদীর ১/৪৩]। আর এখানে **يُؤْمِنُونَ** না বলে **يُوقِنُونَ** ব্যবহার করার কারণ হচ্ছে, ইয়াকীন অর্থ হচ্ছে, সন্দেহাতীত জ্ঞান ও দৃঢ় প্রত্যয় যা 'আইনুল ইয়াকীন' বা স্বচক্ষে দেখা কোন বস্তুর মত। আখিরাতের প্রতি ঈমান এই রকমের দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে হওয়া অপরিহার্য।

**আল–কুরআনে বর্ণিত মু'মিনগণের আর কতিপয় বৈশিষ্ট:** মহান আল্লাহর কিতাবে মু'মিনদের প্রচুর গুণাবলীর কথা উল্লেখিত হয়েছে, তন্মধ্যে কতিপয় স্পষ্ট ও গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট তুলে ধরা হলো;

**(১) আল্লাহর পরিপূর্ণ ভয়,** মহান আল্লাহ বলেন,

**{إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ}**

'নিশ্চয় যারা তাদের রবের ভয়ে সন্ত্রস্ত', [আল– মু'মিনূন– ২৩: ৫৭]। অন্য আরেকটি আয়াতে আল্লাহ বলেন,

**{إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ}**

'সে তো শাইতান, সে তোমাদেরকে তার বন্ধুদের ভয় দেখায়; অতএব যদি তোমরা মু'মিন হও তবে তাদেরকে ভয় করো না, আমাকেই ভয় কর', [আলে 'ইমরান– ৩: ১৭৫]।

মু'মিনগণ দুনিয়াতে আল্লাহর ভয়হীন, চিন্তামুক্ত ও অহংকারীর ন্যায় জীবন যাপন করে না। বরং তাদের মন সর্বদাই আল্লাহর ভয়ে ভীত থাকে। এমনকি তারা এ ভয়েও ভীত থাকে যে, আমাদের নেক 'আমলগুলো কবুল করা হচ্ছে কি না?

আয়াত দুটিতে **خَوْفٌ** (খাওফুন) ও **خَشْيَةٌ** খাশইয়াতুন শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। (**خَوْف**) 'খাওফ' হলো, কোন খারাপ পরিণতির আশংকা থেকে স্বাভাবিক যে ভয় সৃষ্টি হয়। আর (**خَشْيَة**) খাশইয়া হলো, বিশেষ ভয়, যা জ্ঞান অর্জন ও সম্মানের সাথে সৃষ্টি হয়। যেমন

'আলিমগণের আল্লাহকে জেনে বুঝে ভয় করাকে 'খাশইয়া' বলা হয়েছে, [সূরা ফাতির– ৩৫: ২৮]।

**দুই. মু'মিনগণের আরেকটি বৈশিষ্ট হচ্ছে; আল্লাহর উপর ভরসা করা**। যে কোন কাজ সম্পন্ন করার জন্য যেসব উপায়– উপকরণ আছে সেগুলো ব্যবহার করার পর ভরসা করবে। উপায়– উপকরণের উপর কোন প্রকার ভরসা করবে না। কেননা উপায়– উপকরণ গ্রহণ করা তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী নয়। 'উমার (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি,

**لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَوَكَّلُونَ عَلَى اللهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرُزِقْتُمْ كَمَا يُرْزَقُ الطَّيْرُ تَغْدُو خِمَاصًا وَتَرُوحُ بِطَانًا**

তোমরা যদি আল্লাহর উপর ভরসা করার মতো ভরসা করতে তাহলে তিনি তোমাদেরকে রিযক দান করতেন, যেমন তিনি পাখিদেরকে রিযক দান করেন। পাখিরা সকাল বেলা ক্ষুধার্ত অবস্থায় বেরিয়ে যায় আর পেট ভর্তি অবস্থায় ফিরে আসে', [সুনানুত তিরমিযী ১/১৫১, নং ২৩৪৪, মুসনাদ আহমাদ ১/৪৩৮, নং ৩৭০, ইমাম আত-তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান সাহীহ বলেছেন, আলবানীসহ অন্যান্য গবেষকগণ সাহীহ বলেছেন]।

**তিন. সালাতে বিনয়ী হওয়া এবং সালাতের রক্ষণাবেক্ষণ করা**। মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ তা'আলা বলেন,

**{قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ. الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ}**

'মু'মিনগণ নিশ্চিত সফলতা অর্জন করেছে, যারা তাদের সালাতে বিনয়ী হয়', [আল–মু'মিনুন– ২৩: ১– ২]। আর সালাতে খুশু' খুযুউ ও বিনয়ী হওয়া অপরিহার্য।

**চার. মু'মিনদের আরেকটি বৈশিষ্ট হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলার পথে ব্যয় করা**, 'আব্দুল্লাহ ইবন উমার (রা) থেকে বর্ণিত, যে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

**الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غِنًى، وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ**

'উপরের হাত নীচের হাতের চেয়ে উত্তম। আর তুমি তাদের দিয়ে শুরু কর, যাদের তুমি ভরণ–পোষণ কর। আর ঐ দান সর্বোত্তম যা সচ্ছলতার সাথে হয়। আর যে ব্যক্তি আত্মমর্যাদা রক্ষা করে চলে আল্লাহ তাকে আত্মমর্যাদা সম্পন্ন করেন। আবার যে ব্যক্তি নিজেকে সচ্ছল মনে করে আল্লাহ তাকে সচ্ছল করে দেন', [সাহীহুল বুখারী ২/১১২, নং ১৪২৭, সাহীহ মুসলিম ২/৭১৭, নং ১০৩৪]। 'আদি ইবন হাতিম (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

**مَا مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا سَيُكَلِّمُهُ رَبُّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تُرْجُمَانٌ، فَيَنْظُرُ أَيْمَنَ مِنْهُ فَلاَ يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ مِنْ عَمَلِهِ، وَيَنْظُرُ أَشْأَمَ مِنْهُ فَلاَ يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ، وَيَنْظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلاَ يَرَى إِلَّا النَّارَ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ، فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ**

'তোমাদের যে কোন ব্যক্তির সাথে তার রব তো সরাসরি কথা বলবেন, তাঁর মাঝে ও ব্যক্তির মাঝে কোন দোভাষী থাকবে না। সে তখন তার ডান পাশে তাকিয়ে শুধু তার 'আমল দেখবে যা সে অগ্রিম পাঠিয়েছিল। আবার সে তার বাম দিকে তাকাবে তখনও শুধু তাই দেখবে যা সে অগ্রিম পাঠিয়েছিল। সে তার সামনের দিকে তাকাবে তখন সে তার সামনে শুধু জাহান্নামই দেখতে পাবে। অতএব তোমরা খেজুরের অর্ধেক অংশ পরিমাণ দান করে হলেও জাহান্নামের আগুন থেকে বেঁচে থাক', [সাহীহুল বুখারী ৯/১৪৮, নং ৭৫১২, সাহীহ মুসলিম ২/৭০৩, নং ১০১৬]।

কুরআন কারীমে মু'মিনদের আর অনেক গুণাগুণের বর্ণনা রয়েছে। যেমন; মু'মিনগণ অনর্থক কর্মকান্ড এড়িয়ে চলে। এসব কাজে জড়িত হয় না, তারা আমানত ও চুক্তিসমূহ সংরক্ষণ করে ও পূরণ করে, পবিত্র জীবন যাপন করে ইত্যাদি গুণাগুণে গুণান্বিত হয়। যেসব গুণাগুণের কথা সূরা আল- মু'মিনুনের প্রথম আয়াতগুলোতে বর্ণিত হয়েছে। আয়াতে আর নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছে যে, এসব গুণাগুণ ও বৈশষ্টের অধিকারী মানুষগুলো উভয় জগতেই কল্যাণ লাভ ও সফলতা অর্জন করবে।

এটা তো স্বতঃসিদ্ধ কথা যে, মানুষের হৃদয়- মনে যখন প্রকৃত ঈমান প্রতিষ্ঠা লাভ করে তখন ঈমান তাকে সকল প্রকারের বিচ্যুতি ও ভ্রষ্টতা, গোঁড়ামী ও কঠোরতা থেকে রক্ষা করে। অপরদিকে নিজের ও অন্য মানুষের কল্যাণকামী হয় এবং সাহনুভূতিশীল হয়। ব্যক্তি মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়ে মানুষের ক্ষতি করে না, মিথ্যা কথা বলেনা এবং আজে- বাজে লোকদের সাথে সঙ্গ ত্যাগ করে, তাদের সাথে উঠাবসা করেনা, বৈঠকাদিতে বাজে আড্ডা দেয়া ইত্যাদি গর্হিত কাজ এড়িয়ে চলে। বরং তিনি সবসময় নিজের, দেশের, সমাজের সার্বিক কল্যাণের কাজে আত্মনিয়োগ করে। আল্লাহর বিধান বাস্তবায়নের মাধ্যমে একটি মানবিক ও ইনসাফপূর্ণ কল্যাণ সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে জীবন ও সম্পদ ব্যয় করে।

**সৎ কাজের আদেশ ও অন্যায় কর্মে নিষেধ করা,** আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নিরংকুশ আনুগত্য করা। হকদারদের কাছে তাদের হক যথাযথভাবে আদায় করা। মহান আল্লাহ বলেন,

**{وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ}**

'আর মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারী একে অপরের বন্ধু, তারা সৎকাজের আদেশ করে ও অসৎকাজে নিষেধ করে, সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে; তারাই সে সব লোক, যাদেরকে আল্লাহ অচিরেই দয়া করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়', [আত্- তাওবাহ- ৯: ৭১]।

**সকল গুনাহ থেকে খাঁটি তাওবা করা,** নিয়মিত তাওবা করা, আল্লাহর আদেশ ও নিষেধের প্রতি অনুগত থাকা। তাঁর বেঁধে দেয়া সীমারেখার হেফাযত করা, সদাসর্বদা নিয়মিত সকল প্রকারের 'ইবাদাত করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ}

'তারা তাওবাকারী, 'ইবাদাতকারী, আল্লাহর প্রশংসাকারী, সিয়াম পালনকারী, রুকু'কারী, সিজদাহকারী, সৎকাজের আদেশদাতা, অসৎকাজের নিষেধকারী, এবং আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখা হিফাযতকারী; আর আপনি মু'মিনদেরক সুসংবাদ দিন', [আত্– তাওবাহ– ৯: ১১২]। উল্লেখ্য যে, এসব গুণ সেসব মু'মিনের যাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে 'আল্লাহ জান্নাতের বিনিময়ে তাদের জীবন ও সম্পদ ক্রয় করেছেন', [আত্– তাওবাহ– ৯: ১১১]। আল্লাহর পথে জিহাদকারী সবাই এ আয়াতের মর্মভূক্ত। তবে এসব গুণাগুণ শর্তরূপে উল্লেখ করা হয়নি। কারণ আল্লাহর পথে কেবল জিহাদের বিনিময়েই জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে। তবে জান্নাতের উপযুক্ত মু'মিনগণ এসব গুণাগুণ ও বৈশিষ্টের অধিকারী হয়ে থাকে, [তাফসীরুল কুরতুবী ৮/২৭১]।

**দুনিয়ার ভোগ–বিলাস ও কামনা– বাসনা ত্যাগ করা,** অধিক পরিমাণ সৎকর্ম ও আল্লাহর আনুগত্যকে আঁকড়ে ধরা। আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের প্রবল আকাঙ্খা মনে ধারণ করা এবং জান্নাত লাভে ধৈন্য হওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ. لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ}

'সেসব লোক, যাদেরকে ব্যবসা– বানিজ্য ও ক্রয়– বিক্রয় কোনটিই আল্লাহর স্মরণ হতে এবং সালাত কায়েম ও যাকাত প্রদান হতে বিরত রাখে না, তারা ভয় করে সে দিনকে যেদিন অনেক অন্তর ও দৃষ্টিসমূহ উল্টে যাবে। যাতে তারা যে উত্তম কাজ করে তার জন্য আল্লাহ তাদেরকে পুরস্কার দেন এবং তিনি নিজ অনুগ্রহে তাদের প্রাপ্যের বেশী দেন। আর আল্লাহ যাকে ইচ্ছে অপরিমিত জীবিকা দান করেন', [আন্– নূর– ২৪: ৩৭]।

**মু'মিনদের আরেকটি বৈশিষ্ট হচ্ছে, সর্বদা আল্লাহর নৈকট্য লাভের চেষ্টা করা।** আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ}

'শুধু তারাই আমাদের আয়াতসমূহের উপর ঈমান আনে, যারা সেটার দ্বারা উপদেশপ্রাপ্ত হলে সাজদায় লুটিয়ে পড়ে এবং তাদের রবের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে, আর তারা অহংকার করে না', [আস্– সাজদাহ– ৩২: ১৫]।

**আল্লাহর শাস্তির ভয়ে গুনাহ ও পাপকর্মে পতিত হওয়া থেকে দুরে থাকাও** মু'মিনগণের আরেকটি বৈশিষ্ট। আল্লাহ সুবহানাহু বলেন,

{وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ}

'আর যারা কবীরা গুনাহ ও অশ্লীল কাজ থেকে বেঁচে থাকে এবং যখন রাগান্বিত হয় তখন তারা ক্ষমা করে দেয়', [আশ– শুরা– ৪২: ৩৭]। অর্থাৎ তারা ক্ষুব্ধ ও ক্রোধান্বিত হলে প্রতিশোধ নেন না বরং ক্ষমা করে দেন।

**মু'মিনদের গুণাবলীর মধ্যে রয়েছে আত্মঅহংকার, গর্ব বোধ এবং নিজের অতিরঞ্জণ প্রশংসা ও স্তুতি না করা**। বরং তারা সব সময় নিজের আত্মাকে পবিত্র করা ও পরিশোধিত করার কাজে নিয়োজিত থাকে। আল্লাহ বলেন,

**{الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى}**

'যারা গুরতর পাপ ও অশ্লীল কাজ থেকে বিরত থাকে, ছোটখাট অপরাধ ব্যতীত। নিশ্চয় আপনার রবের ক্ষমা অপরিসীম; তিনি তোমাদের সম্পর্কে সম্যক অবগত, যখন তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছিলেন মাটি হতে এবং যখন তোমরা মাতৃগর্ভে ভ্রুণরূপে ছিলে। অতএব তোমরা আত্ম প্রশংসা করো না, তিনিই সম্যক জানেন তার সম্পর্কে যে তাকওয়া অবলম্বন করেছে', [আন্– নাজম– ৫৩: ৩২]।

**মানুষের অধিকারসমূহের প্রতি যত্নবান হওয়া মু'মিনগণের আরেকটি বৈশিষ্ট**। তাছাড়াও অসংখ্য সওয়াব লাভের আশায় অভাবী, দুস্থ, দূর্বল ও অসহায় মানুষরদের প্রয়োজন পূরণের জন্য সর্বক্ষণ কাজ করা। আল্লাহ বলেন,

**{ يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا}**

'তারা মানত পূর্ণ করে এবং সে দিনের ভয় করে, যে দিনের অকল্যাণ হবে ব্যাপক। আর তারা মহব্বত থাকা সাপেক্ষে অভাবগ্রস্ত, ইয়াতীম ও বন্দিকে খাবার দান করে, এবং বলে, শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে আমরা তোমাদেরকে খাবার দান করি, আমরা তোমাদের কাছ থেকে প্রতিদান চাই না, কৃতজ্ঞতাও নয়', [আদ্– দাহ্র– ৭৬: ৭– ১০]।

**তাছাড়াও কুরআন কারীম ও সুন্নাতে যেসব উত্তম গুণাবলী অর্জনের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে** সেগুলো অর্জন করার যথাসাধ্য চেষ্টা করা। যেমন বিনয়, নম্রকথা ও আচরণ, তাহাজ্জুদ ও কিয়ামুল লাইল করা, মিতব্যয়ী হওয়া, অপচয় ও অপব্যয় না করা, ধৈর্য ধারণ করা এবং একে অপরকে উপদেশ দেয়া। অনুগ্রহ সম্পন্ন ও লজ্জাশীল হওয়া, দীনের উপর সুদৃঢ় থাকা, দয়া, উদারতা, ইনসাফ ও ন্যায় নিষ্ঠা, ইহসান, অন্যকে অগ্রাধিকারসহ উত্তম গুণাগুন অর্জন করা উচিত, যেসব গুণাগুণে গুণান্বিত হওয়ার জন্য কুরআন কারীম সর্বদাই উদ্বুদ্ধ করে।

**সুতরাং মু'মিনগণের উচিত,** তাদের অন্তরসমূহে ঈমান বৃদ্ধির কাজ করা। কেননা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুত্যের মাধ্যমে ঈমান বৃদ্ধি লাভ করে আর পাপ ও ক্রুটির কারণে ঈমানের হ্রাস হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

**{هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ}**

'তিনি সেই সত্তা, যিনি মু'মিনদের অন্তরে সাকীনা –প্রশান্তি নাযিল করেছেন, যাতে তারা তাদের ঈমানের সাথে ঈমানকে আরও বৃদ্ধি করতে পারে', [আল– ফাতহ– ৪৮: ৪]।

মু'মিনগণ অন্যায় ও পাপ কর্মে লিপ্ত হবে না। পাপের কারণে মানুষের চেহারা কাল হয়ে যায়। অন্তর ও কবর অন্ধকার হয়ে যায়, রিযক সংকীর্ণ হয়, শরীরে দুর্বলতা আক্রমণ করে, মানুষের অন্তরে তার ব্যাপারে ঘৃণার সৃষ্টি হয়। পক্ষান্তরে সৎকর্মের মাধ্যমে মানুষের মুখমন্ডল উজ্জ্বল হয়, হৃদয়– মন ও কবর আলোকিত হয়। রিযকের প্রশস্ততা আসে, শরীরে শক্তি বৃদ্ধি পায় আর মানুষের অন্তরে তাদের ব্যাপারে ভালবাসার সৃষ্টি হয়।

**শিক্ষাসমূহ,** দারসে উল্লেখিত আয়াত ও আলোচনায় আসা আয়াতগুলোতে অনেক শিক্ষা রয়েছে। তন্মধ্যে কতিপয় শিক্ষা তুলে ধরা হলো;

**এক.** মু'মিনদের বৈশিষ্টসমূহের মধ্যে ঈমান ও ইসলামের মৌলিক ভিত্তি সমূহের প্রতি বিশ্বাসী হওয়া এবং সন্দেহাতীত ও চাক্ষুষ দেখার মত কঠিন বিশ্বাস করা আবশ্যক।

**দুই.** প্রত্যেক মু'মিনের জানা উচিত যে, গায়বের প্রতি ঈমান, পরকালের প্রতি ঈমান, সমস্ত নাবী– রাসূল ও তাদের প্রতি নাযিল হওয়া আসমানী কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান আনা হচ্ছে ঈমানের ছয়টি মূল ভিত্তি (আরকানুল ঈমান) এর উপর ঈমান আনা।

**তিন.** সালাত কায়েম করা, যাকাত আদায় করা ইসলামের পাঁচটি ভিত্তির অন্যতম ভিত্তি। যেগুলো আরকানুল ইসলাম বা ইসলামের ভিত্তিসমূহের অন্যতম দুটি ভিত্তি। যার একটি শারীরিক 'ইবাদত আর অপরটি অর্থনৈতিক ইবাদাত। মু'মিনগণের এসব বিষয়ে 'ইলম থাকা অপরিহার্য।

**চার.** মু'মিনদের অসংখ্য গুণ ও বৈশিষ্ট রয়েছে, এগুলো অর্জনের মাধ্যমে আল্লাহর প্রতি পরিপূর্ণ অনুগত হওয়ার চেষ্টা করা এবং একমাত্র আল্লাহর দাসত্ব কায়েম আবশ্যক।

মহান করুণাময় আল্লাহ যেন আমাদের এ আলোচনার শিক্ষাগুলোর আলোকে কাঙ্খিত বৈশিষ্ট অর্জন করে তাঁর নৈকট্য লাভ ও তাঁর অপরিসীম পুরস্কারে ধৈন্য হওয়ার তাওফীক দান করেন! আমীন!!

**প্রফেসর শাইখ ড. মুহাম্মাদ আব্দুস সামাদ**

১৪ নং পৃষ্ঠায়

আবাবিল বিজ্ঞাপন

# সহনশীলতা : মানবজীবনের একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلاً قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِى قَرَابَةً أَصِلُهُمْ وَيَقْطَعُونِى وَأُحْسِنُ إِلَيْهِمْ وَيُسِيئُونَ إِلَىَّ وَأَحْلُمُ عَنْهُمْ وَيَجْهَلُونَ عَلَىَّ. فَقَالَ « لَئِنْ كُنْتَ كَمَا قُلْتَ فَكَأَنَّمَا تُسِفُّهُمُ الْمَلَّ وَلاَ يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللَّهِ ظَهِيرٌ عَلَيْهِمْ مَا دُمْتَ عَلَى ذَلِكَ.

**অনুবাদ**

আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। "এক ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমার একজন নিকটাত্মীয় রয়েছে। আমি তার সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক রাখি কিন্তু সে আমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে চলে। আমি তার সাথে সদ্ব্যবহার করি কিন্তু সে আমার সাথে দুর্ব্যবহার করে। আমি তার সাথে সহনশীলতা প্রদর্শন করি কিন্তু সে আমার সাথে মূর্খতা সুলভ আচরণ করে। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, তুমি যা বললে প্রকৃত অবস্থা যদি তা-ই হয় তবে তুমি তার প্রতি জ্বলন্ত অঙ্গার নিক্ষেপ করলে। (এর প্রতিদান স্বরূপ) তোমার সাথে সব সময়ের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের বিপক্ষে একজন সাহায্যকারী (ফেরেশতা) নিয়োজিত থাকবে, যতক্ষণ তুমি এই অবস্থার ওপর অবিচল থাকবে"।[১]

**ব্যাখ্যা**

মহান আল্লাহ অসংখ্য দায়িত্ব দিয়ে মানুষকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। এই দায়িত্বের কিছু আছে ব্যক্তি পর্যায়ের আবার কিছু আছে সামাজিক পর্যায়ের। মানুষ কখনো সেই দায়িত্ব পালন করে আবার কখনো দায়িত্বের কথা ভুলে যায়। বর্ণিত হাদীসে বেশ কয়েকটি সামাজিক দায়িত্বের কথা বলা হয়েছে। যেমন- আত্মীয়তার বন্ধন অটুট রাখা; সদ্ব্যবহার; সহনশীল আচরণ করা এবং সর্বক্ষেত্রে মূর্খতাসুলভ আচরণ পরিহার করা। উল্লেখ্য, আমরা অত্র দারসুল হাদীসে মহানবজীবনে সহনশীলতার অপরিহার্যতা বিশেষভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করবো।

প্রথমেই আত্মীয়তার বন্ধন সুরক্ষার ব্যাপারে আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাক। এবিষয়ে কুরআন ও হাদীসে বিশেষভাবে উৎসাহিত করা হয়েছে আবার আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন

১. মুসলিম, কিতাবুল বিররি ওয়াস-সিলাতি ওয়াল আদাব, বাবঃ সিলাতুর রাহিমি ওয়া তাহরীমি কাতয়িহা, নং ৬৬৮৯

করার ব্যাপারে কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে।
মহান আল্লাহ বলেন,

وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ . وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ . جَنَّاتُ عَدْنٍ ...

"এবং আল্লাহ যে সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন,যারা তা অক্ষুণ্ণ রাখে, তাদের রবকে ভয় করে এবং ভয় করে কঠোর হিসাবকে এবং যারা তাদের রবের সন্তুষ্টি লাভের জন্য ধৈর্যধারণ করে, সালাত আদায় করে, আমি তাদেরকে যে জীবনোপকরণ দিয়েছি তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে এবং যারা ভালো দ্বারা মন্দকে দূরীভূত করে, তাদের জন্য রয়েছে পরকালের আবাস স্থায়ী জান্নাত"... ।[২]

আত্মীয়তার বন্ধন অটুট রাখার ব্যাপারে হাদীসেও বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضى الله عنه قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ « مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ رِزْقُهُ أَوْ يُنْسَأَ لَهُ فِى أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ » .

'আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলতে শুনেছি, " যে ব্যক্তি সন্তুষ্ট চিত্তে কামনা করে যে, তার রিয্ক প্রশস্ত করে দেয়া হোক অথবা তার জীবনের অবশিষ্ট আয়ু দীর্ঘ করা হোক, যে যেনো তার আত্মীয়দের সাথে বন্ধন অটুট রাখে" ।[৩]

অপরদিকে আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারীদের ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেন,

وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ.

"এবং যারা আল্লাহর সাথে দৃঢ় অঙ্গিকারে আবদ্ধ হওয়ার পর তা ভঙ্গ করে, যে সম্পর্ক অটুট রাখার জন্য আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন তা ছিন্ন করে এবং পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করে, তাদের জন্য রয়েছে লা'নত এবং তাদের জন্য আছে নিকৃষ্ট আবাস" ।[৪]

عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ قَالَ : النَّبِيَّ ﷺ – يَقُولُ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ.

জুবাইর ইবন মুতয়িম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) বলেছেন, "আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না" ।[৫] অপর এক হাদীসে উল্লেখ আছে,

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مُدْمِنُ خَمْرٍ،

২. সূরা আর-রা'দ, ১৩: ২১-২৩
৩. বুখারী, কিতাবুল বুয়ূ, বাব : মান আহাব্বাল বাসতা ফির-রিয্ক, নং ২০৬৭
৪. সূরা আর-রা'দ, ১৩: ২৫
৫. বুখারী, কিতাবুল আদাব, বাবঃ ইসমুল কাতি, নং ৫৯৮৪

وَلَا قَاطِعُ رَحِمٍ-

'আবদুল্লাহ ইবন 'আমর সূত্রে নবী (স) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মাদকাসক্ত ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না, জান্নাতে প্রবেশ করবে না আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারীও"...। [৬]

উপরোক্ত আলোচনার মাধ্যমে আত্মীয়তার সম্পর্ক অটুট রাখার কল্যাণ এবং সম্পর্ক ছিন্ন করার কুফল বর্ণিত হয়েছে।

হাদীসটির দ্বিতীয় অংশে সদাচরণের গুরুত্ব বর্ণনা করা হয়েছে। এবিষয়ে কুরআন ও হাদীসে ব্যাপক নির্দেশনা রয়েছে।

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ –

"নিশ্চয় আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ ও আত্মীয়-স্বজনকে দানের নির্দেশ দেন এবং তিনি নিষেধ করেন অশ্লীলতা, অসৎকাজ ও সীমালঙ্ঘন। তিনি তোমাদের উপদেশ দেন যাতে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করো"। [৭]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسَ الْمُزَنِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ –ﷺ– قَالَ « السَّمْتُ الْحَسَنُ وَالتُّؤَدَةُ وَالاِقْتِصَادُ جُزْءٌ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ

'আবদুল্লাহ ইবন সারজিস আল মুযানী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন, "উত্তম আচরণ, দৃঢ়তা-স্থিরতা ও মধ্যমপন্থা অবলম্বন হচ্ছে নবুওয়াতের চব্বিশ ভাগের একভাগ'।[৮]

عَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ –ﷺ– يَقُولُ « مَا مِنْ شَىْءٍ يُوضَعُ فِى الْمِيزَانِ أَثْقَلُ مِنْ حُسْنِ الْخُلُقِ وَإِنَّ صَاحِبَ حُسْنِ الْخُلُقِ لَيَبْلُغُ بِهِ دَرَجَةَ صَاحِبِ الصَّوْمِ وَالصَّلاَةِ ».

আবূ দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী (সা) কে বলতে শুনেছি: " (কিয়ামতের দিন) দাড়িপাল্লায় সদাচরণ সর্বাধিক ভারী হবে। সচ্চরিত্রবান ও সদাচারী ব্যক্তি তার সদাচার ও চরিত্র-মাধুর্য দ্বারা রোযাদার ও নামাযীর পর্যায়ে পৌঁছে যায়"।[৯]

عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –ﷺ– « لاَ تَكُونُوا إِمَّعَةً تَقُولُونَ إِنْ أَحْسَنَ النَّاسُ أَحْسَنَّا وَإِنْ ظَلَمُوا ظَلَمْنَا وَلَكِنْ وَطِّنُوا أَنْفُسَكُمْ إِنْ أَحْسَنَ النَّاسُ أَنْ تُحْسِنُوا وَإِنْ أَسَاءُوا فَلاَ تَظْلِمُوا »

হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, " তোমার এরূপ অনুকরণপ্রিয় হয়ো না যে, তোমরা বলবে, লোকজন আমাদের সাথে ভালো ব্যবহার

---

৬. আল-বায়হাকী, শু'আবুল ঈমান, নং ৭৪৯২
৭. সূরা আন-নাহল, ১৬ : ৯০
৮. তিরমিজি, আবওয়াবুল বিররি ওয়াস সিলাতি, বাব : মা জাআ ফিত-তান্নী ওয়াল আজালাতি, নং ২১৪১
৯. তিরমিযী, আবওয়াবুল বিররি ওয়াস সিলাতি, বাব : মা জাআ ফী হুসনিল খালক, নং ২১৩৪

করলে আমরাও ভালো ব্যবহার করবো এবং তারা যদি আমাদের ওপর যুলুম করে তবে আমরাও তাদের প্রতি যুলুম করবো। বরং তোমরা নিজেদের মনের গহীনে একথা বদ্ধমূল করে নাও যে, লোকজন তোমাদের সাথে ভালো ব্যবহার করলে তোমরাও ভালো ব্যবহার করবে। পক্ষান্তরে তারা তোমাদের প্রতি অন্যায় আচরণ করলে তোমরা তাদের সাথে যুলুম করবে না"। [১০]

উপরোক্ত আলোচনার মধ্য দিয়ে সদাচরণের গুরুত্ব এবং যুলুমের ভয়াবহ পরিণামের কথা সুস্পষ্টভাবে ফুটে ওঠেছে।

হাদীসটির শেষাংশে সহনশীলতার গুরুত্ব বর্ণনা করা হয়েছে। উল্লেখ্য, মানবজীবনে সহনশীলতা অত্যন্ত প্রশংসনীয় গুণ। এই গুণ মানুষের চারিত্রিক সৌন্দর্যকে আরো বিকশিত করে। অপরদিকে সহনশীলতার অভাবে জীবন কলুষিত হয়ে পড়ে। এবিষয়ে কুরআন ও হাদীসে যেমন প্রেরণাদায়ক ব্যাপক তথ্য-উপাত্ত রয়েছে অনুরূপভাবে এর অনুপস্থিতিতে ভয়াবহ পরিণামের কথাও রয়েছে। প্রথমেই আমরা সহনশীলতার বিষয়ে ধারণা দিতে চেষ্টা করবো। প্রথমত আমরা সহনশীলতা (الحلم) সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা নেয়ার চেষ্টা করবো।

আল-হিলমু (الحلم) শব্দটি আরবী। এটি ক্রিয়ামূল। মূলধাতু হা-লাম-মীম (ح–ل–م)। এটি তাড়াহুড়াবর্জন ও ধীর-স্থিরতা অর্থে ব্যবহৃত হয় (ইবন ফারিস, মাকায়িয়্যুসুল লুগাত, ২/৯৩)। তিনি আরো বলেন, আল-হিলমু (الحلم) শব্দটি আত-তাইশু (বুদ্ধির অস্থিরতা) শব্দের বিপরীত শব্দ। আল-জাওহারী বলেন, আল-হিলমু (الحلم) শব্দটি ধীর-স্থিরতা অর্থে ব্যবহৃত হয়। এর বহুবচন আহলাম ও হুলুমুন (الاحلام –حلوم)। এর বাংলা প্রতিশব্দ সহনশীলতা। ইংরেজি প্রতিশব্দ Tolerence. সহনশীলতা বলতে বোঝায় অন্যের ভুল বা মতামতকে ধৈর্যের সাথে গ্রহণ করা এবং কোনো ধরনের বিরক্তি প্রকাশ না করে ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখা। এটি সংকীর্ণতা, ক্রোধ ও বিদ্বেষের বিপরীত অর্থে ব্যবহৃত হয়।

ইমাম আল-গাযালী (র) বলেন, আল-হালীম (الحليم) শব্দটি মহান আল্লাহর গুণবাচক নাম। এর অর্থ হচ্ছে, মহান আল্লাহ তাঁর অবাধ্য বান্দাদের যাবতীয় কার্যক্রম দেখেন, কিন্তু তাৎক্ষণিক শাস্তি না দিয়ে বরং শোধরাবার সময় দেন। এই অর্থে মহান আল্লাহ হালীম (পরম সহিষ্ণু)।

আর-রাগিব আল-আসফাহানী বলেন, আল-হিলমু (الحلم) দ্বারা প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রণ ও ক্রোধদমন বোঝায় (আল-মুফরাদাত, পৃ. ১২৯)। আল-জাহিয বলেন, আল-হিলমু (الحلم) শব্দটি প্রচণ্ড ক্রোধান্বিত হওয়া এবং প্রতিশোধ গ্রহণের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও প্রতিশোধ না নেয়া অর্থে ব্যবহৃত হয় (তাহযীবুল আখলাক,পৃ. ২৩)। আল-জুরজানী বলেন, আল-হিলমু (الحلم) বলতে রাগের সময় অন্তরের প্রশান্তি পুরোপুরি বজায় থাকা বোঝায় (আত-তা'রীফাত,পৃ. ৯২)।

---

১০. তিরমিযী, আবওয়াবুল বিররি ওয়াস সিলাতি, বাব : মা জাআ ফিল-ইহ্সানি ওয়াল আফয়ি, নং ২১৩৮

**সহনশীলতার গুরুত্ব**

মানবজীবনে সহনশীলতার গুণাবলী অর্জন করার গুরুত্ব অপরিসীম। এ সম্পর্কে হাদীসে ব্যাপক নির্দেশনা রয়েছে।

**عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ألا أدلكم على ما يرفع الله به الدرجات ؟ قالوا : نعم يا رسول الله . قال : تَحْلُمُ عَنْ مَنْ جَهِلَ عَلَيْكَ، وَتَعْفُو عَنْ مَنْ ظَلَمَكَ، وَتُعْطِي مَنْ حَرَمَكَ، وَتَصِلُ مَنْ قَطَعَكَ.**

'উবাদা ইবনুস সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, "আমি কি তোমাদেরকে এমন বিষয় সম্পর্কে অবহিত করবো না, যা দ্বারা আল্লাহ তোমাদের মর্যাদা সমুন্নত করবেন? তারা বলেন, হাঁ; হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বলেন, যে ব্যক্তি অজ্ঞতাবশত তোমার সাথে অসদাচরণ করবে, তুমি তার প্রতি সহনশীলতা প্রদর্শন করবে; যে ব্যক্তি তোমার প্রতি যুলুম করবে, তুমি তাকে ক্ষমা করবে; যে ব্যক্তি তোমাকে বঞ্চিত করবে, তুমি তাকে দান করবে এবং যে ব্যক্তি তোমার সাথে আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে, তুমি তার সাথে সম্পর্ক অটুট রাখবে"।[১১]

**عن عائشة ﷺ قالت سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول : وجبت محبة الله على من أغضب فحلم.**

'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলতে শুনেছি, "আল্লাহর ভালোবাসা ঐ ব্যক্তির জন্য অবধারিত হয়ে যায়, যাকে ক্ষুব্ধ করা হলেও সে সহনশীলতা প্রদর্শন করে"।[১২]

**حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمُهَيْمِنِ بْنُ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِىِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- الأَنَاةُ مِنَ اللَّهِ وَالْعَجَلَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ ».**

'আবদুল মুহাইমীন ইবন আব্বাস ইবন সাহল ইবন সা'দ আস সা'ঈদী (র) সূত্রে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, "ধৈর্য ও স্থিরতা আল্লাহর পক্ষ থেকে আর তাড়াহুড়া শয়তানের পক্ষ থেকে"।[১৩] উপরোক্ত হাদীস থেকে সহনশীলতার গুরুত্ব প্রমাণিত হয়।

**সহনশীলতা অর্জনের উপায়**

সহনশীলতা অর্জনের জন্য প্রথমত প্রয়োজন ভিন্নমতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া এবং সক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও প্রতিশোধ গ্রহণ না করে ক্ষমা করা। এককথায় মহানবী (স) এর আখলাককে সামগ্রিকভাবে ধারণ করার মাধ্যমেই সহনশীলতা চর্চা করা সম্ভব। যেমন

১১. আত-তারগীব ওয়াত তারহীব, ৩/ কিতাবুল আদাব, বাব: ফির-রিফকি ওয়াল আনাতি ওয়াল হিলমি, নং ২৩
১২. আত-তারগীব ওয়াত তারহীব, ৩/ কিতাবুল আদাব, বাব: ফির-রিফকি ওয়াল আনাতি ওয়াল হিলমি, নং ২২
১৩. তিরমিজি, আবওয়াবুল বিররি ওয়াস সিলাতি, বাব : বাব : মা জাআ ফিত-তান্নী ওয়াল আজালাতি, নং ২১৪৪

মহান আল্লাহ বলেন-

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ .

"তুমি ক্ষমাপরায়ণতা অবলম্বন করো, সৎকার্যের নির্দেশ দাও এবং অজ্ঞদের এড়িয়ে চলো'।[১৪]

**ধৈর্যধারণের প্রতিদান**

মহান আল্লাহ মানুষকে যতগুলো গুণাবলি দান করেছেন, ধৈর্যশীলতা সেসবের অন্যতম। এবিষয়ে মহান ও হাদীসে ব্যাপক নির্দেশনা পাওয়া যায়। যেমন-

قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ.

" বলো, হে মুমিন বান্দাগণ! তোমরা তোমাদের প্রতিপালকককে ভয় করো। যারা এই দুনিয়াতে কল্যাণকর কাজ করে তাদের জন্য রয়েছে কল্যাণ। আর আল্লাহর যমীন প্রশস্ত, ধৈর্যশীলদের জন্য অপরিমিত পুরস্কার দেয়া হবে"।[১৫]

সুতরাং মুমিন ব্যক্তিকে উপরোক্ত গুণাবলি ধারনের সর্বোচ্চ চেষ্টা করতে হবে।

**ভালোবাসার মাধ্যমে মন্দের জবাব**

ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ . وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ .

"মন্দ প্রতিহত করো উৎকৃষ্ট দ্বারা। ফলে তোমার সাথে যার শত্রুতা রয়েছে সে তোমার অন্তরংগ বন্ধু হয়ে যাবে। এই গুণের অধিকারী হয় কেবল তারাই, যারা ধৈর্যশীল। এই গুণের অধিকারী হয় কেবল তারাই,যারা মহাভাগ্যবান"।[১৬]

**ধৈর্যের সাথে সংকট মোকাবেলা**

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ –

"হে মুমিনগণ! তোমরা ধৈর্যধারণ করো, ধৈর্যে প্রতিযোগিতা করো এবং সর্বদা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থেকো, আল্লাহকে ভয় করো, যাতে তোমরা সফল হতে পারো"।[১৭]

সুতরাং আমাদেরকে সহনশীলতা অর্জনের লক্ষে সাধ্যমতো চেষ্টা করতে হবে।

**সহনশীলতার সুফল**

সহনশীল ব্যক্তির দু'আ কবুল হয়,পক্ষান্তরে কাজে-কর্মে তাড়াহুড়া করার ফল কখনো সুখকর হয় না। এব্যাপারে হাদীসে নির্দেশনা রয়েছে। যেমন-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ – ﷺ – قَالَ « يُسْتَجَابُ لأَحَدِكُمْ مَا لَمْ يَعْجَلْ يَقُولُ دَعَوْتُ فَلَمْ يُسْتَجَبْ لِى » .

১৪. সূরা আল-আরা'ফ, ৭ : ১৯৯
১৫. সূরা আয-যুমার, ৩৯ : ১০
১৬. সূরা আল-ফুসসিলাত, ৪১ : ৩৪
১৭. সূরা আলে ইমরান, ৩ : ২০০

আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, "তোমাদের যে কারো দু'আ কবূল করা হয়ে থাকে, যদি না সে ফলাফল লাভের জন্য তাড়াহুড়া করে এবং এমন কথা না বলে যে, আমি দু'আ করেছি কিন্তু আমার দু'আ কবূল হয়নি"।[১৮]

**হাদীসের শিক্ষা**

(১) আত্মীয়তার বন্ধন সুরক্ষা করা অপরিহার্য কর্তব্য।

(২) আত্মীয়তার বন্ধন সুরক্ষার মাঝে নিহিত রয়েছে অশেষ কল্যাণ।

(৩) আত্মীয়তার ছিন্ন করার পরিণাম ভয়াবহ।

(৪) সদাচরণ মানুষের অত্যন্ত চমৎকার একটি গুণ।

(৫) সহনশীলতা অনুশীলনের মাধ্যমে পাস্পরিক বন্ধন সুদৃঢ় হয়।

(৬) সহনশীল ব্যক্তির মর্যাদা সবার ওপরে।

(৭) কেবল ভাগ্যবান লোকেরাই সহনশীলতার ন্যায় বৈশিষ্ট্য অর্জন করতে পারে।

মহান আল্লাহ আমাদেরকে উপরোক্ত হাদীসের শিক্ষা গ্রহণ করে জীবনকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করার তাওফীক দিন। আমীন।

**অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ছাইদুল হক**

## আল-ফালাহ বিজ্ঞাপন যাবে

১৮. বুখারী, কিতাবুত দাওয়াত, বাব: ইউসতাজাবু লিল-আবদি মা-লাম-ইউ'আজ্জিল, নং ৬৩৪০

# বাংলাদেশের নিরাপত্তা

আবুল আসাদ

আজকের পৃথিবীটা একটা গ্রামের মত। গ্রামরূপ বিশ্বের পরিবেশ-পরিস্থিতি বাড়িরূপ জাতি-রাষ্ট্রকে প্রভাবিত করছে। যুদ্ধ, শান্তি ও নিরাপত্তার ক্ষেত্রে এটা আরও বেশি সত্য। কোনো দেশে যুদ্ধের আগুন জ্বলে উঠলে তা দুনিয়াকে না পোড়ালেও উত্তপ্ত করে। ২০০১ সালে ধ্বংস হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের টুইন টাওয়ার, কিন্তু তার ফলে বলা যায় বদলে গেছে গোটা দুনিয়ার পরিস্থিতি। আফগান ও ইরাক যুদ্ধ গোটা দুনিয়ার রাজনীতি, অর্থনীতিকে প্রভাবিত করেছে। ছোট হয়ে যাওয়া এই পৃথিবীতে জাতিসংঘের ছায়ায় দাঁড়ানো জাতি রাষ্ট্রের নিরাপত্তা অনেক দিক থেকে আজ যেমন আগের চেয়ে অনেক বেশি নিশ্চিত হয়েছে, তেমনি অপর কিছু দিক থেকে এই নিরাপত্তা বিরাট ঝুঁকির মধ্যেও পড়েছে। আগের মত কোনো দেশ অবশ্য আজ সরাসরি দিগ্বীজয়ে নামছে না, শুধু শক্তির উপর ভিত্তি করে এক দেশ আরেক দেশকে আক্রমণ করে বসছে না। আগ্রাসনের অতীত এই চেহারা আজ পাল্টে গেছে। আজ অস্ত্রই শুধু দ্বিগ্বীজয়ের হাতিয়ার নয়। বাণিজ্য, আর্থিক সাহায্য, কূটনীতি, মিডিয়া, সংস্কৃতি প্রভৃতিও আজ আগ্রাসনের অস্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। সামগ্রিক এই দিকের বিচারে জাতি-রাষ্ট্রের নিরাপত্তা আজ আগের চেয়ে অনেক বেশি বিপজ্জনক। বিশেষ করে বাংলাদেশের মত ছোট রাষ্ট্রগুলো নিরাপত্তার দিক দিয়ে আজ জটিল অবস্থার সম্মুখীন। তার উপর বাংলাদেশ ঘিরে ভূ-রাজনৈতিক যে পরিমন্ডল, তা বাংলাদেশের নিরাপত্তার জন্যে বাড়তি হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাংলাদেশের রাষ্ট্রিক ভূখন্ড গঠনের পেছনে যে ঐতিহাসিক ঘটনা-পরম্পরা রয়েছে তাও বাংলাদেশের নিরাপত্তার প্রতি সব সময় আঙ্গুল উঁচিয়ে রয়েছে।

## আজকের বিশ্ব পরিস্থিতি

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসান, নতুন করে জাতিসংঘের গঠন বিশ্বের রাজনৈতিক চেহারা পাল্টে দেয় এবং আগ্রাসী হওয়ার মত শক্তিগুলোর চরিত্রেও পরিবর্তন নিয়ে আসে। এক দেশ আরেক দেশের উপর নেকড়ের মত ঝাঁপিয়ে পড়ার মত অবস্থার পরিবর্তন নিয়ে আসে। দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের পর ৪৫ বছরের দীর্ঘ ঠান্ডা যুদ্ধকালে যদিও সোভিয়েত ইউনিয়ন তার ট্যাংকের তলায় হাঙ্গেরী ও পোলান্ডের স্বাধীন সত্বাকে পিষ্ট করেছিল, যদিও মার্কিন সৈন্য গ্রেনেডা ও হাইতিতে অবতরণ করেছিল এবং কিউবার উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে গিয়েছিল, যদিও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত, চীন, কোরিয়া ও ভিয়েতনামে পরস্পরের মুখোমুখি হয়েছিল এবং লাখ লাখ মানুষের জীবন হরণ করেছিল, এরপরও এই আগ্রাসনগুলো ছিল একক নয়, সামষ্টিক। দুই পক্ষে দুই ব্লক, পুঁজিবাদী ও কম্যুনিজম আগ্রাসী শক্তির ভূমিকা পালন করেছে। তারাই দখল করে নিতে চেয়েছিল গোটা দুনিয়া। ১৯৯০ সালের পর সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন ঘটলে

কম্যুনিষ্ট ব্লকের বিলুপ্তি ঘটে এবং বিশ্ব মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্রদের একমাত্রিক প্রভাবের অধীনে চলে আসে। এ সময়ই আগ্রাসন আবার নতুন এই সামষ্টিক রূপ পরিগ্রহ করেছিল। জাতিসংঘের আমব্রেলা মাথায় পরে, কিংবা জাতিসংঘকে নিষ্ক্রিয় করে মিত্রদের পাশে রেখে জাতি রাষ্ট্রের উপর আগ্রাসন চালানো হয়। আফগানিস্তান, ইরাক ও সুদানের সার্বভৌমত্ব পদদলিত করা এর কয়েকটি দৃষ্টান্ত। এই আগ্রাসনে অগ্রবাহিনী হিসাবে অর্থনৈতিক অবরোধ এবং সামরিক সরঞ্জামের আদান-প্রদানে বিধি-নিষেধ আরোপকে অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করা হয়।

এই প্রত্যক্ষ আগ্রাসন, হস্তক্ষেপ ছাড়াও সাহায্য নামক অর্থনৈতিক শাসন, কূটনৈতিক চাপ, মিডিয়া সন্ত্রাস ও সাংস্কৃতিক বিকৃতি সাধনের মাধ্যমে তৃতীয় বিশ্বের ছোট ও উন্নয়নশীল দেশগুলোকে দুর্বল, ভীত ও অসহায় খাতে পরিণত করা হচ্ছে।

এক কথায় আজকের দুনিয়ায় নেকড়ে ও মেষ শাবকের মধ্যে আক্রমণ ও আত্মরক্ষার অসম লড়াই চলছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর অতীত বিশ্ব ব্যবস্থায় নেকড়ে সরাসরি মেষ শাবককে ধরে খেয়ে ফেলতো, কিন্তু বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতিতে নেকড়ে মেষ শাবকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার যুক্তি হিসাবে স্বকল্পিত কারণ সৃষ্টি করে এবং সে কারণকে বাহন সাজিয়ে মিত্রদের সাথে নিয়ে জাতিসংঘের সক্রিয় বা নিষ্ক্রিয় সমর্থনে অসহায় মেষ শাবকের ঘাড় মটকায়।

**বাংলাদেশের নিরাপত্তাঃ**

বিশ্ব পরিস্থিতিগত উপরোক্ত নিরাপত্তা-সমস্যা বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও পুরোপুরি বর্তমান। অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের মত সাহায্য নামক মাদক বাংলাদেশও নির্বিচারে গ্রহণ করেছে। যদিও সাহায্য নির্ভরতা আমরা অনেক কমিয়েছি, কিন্তু এখনও সাহায্য না হলে আমাদের চলছে না। ফলে বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ ও ডোনারদের ইচ্ছা ও হুকুমের কাছে আমাদের জনস্বার্থ, রাষ্ট্রের চাহিদা, নিরাপত্তা প্রয়োজন প্রভৃতি কোনো কিছুর মূল্য থাকছে না। তাদেরই চাপে পার্বত্য চট্টগ্রামের রাষ্ট্র বিরোধীদের ষড়যন্ত্রকে 'মানবাধিকার হিসাবে মান্য করে মাথায় তুলে রাখতে হচ্ছে, রাষ্ট্র ও জনগণের বিরুদ্ধে জলজ্যান্ত মিথ্যা অপবাদ ও অপপ্রচারকে 'গণতান্ত্রিক অধিকার' বলে স্বীকার করতে হচ্ছে, উড়ে এসে জুড়ে বসা ভূয়া 'আদিবাসি'দের দাবীকে মানার জন্যে 'প্রকৃত আদিবাসি' বলে স্বীকার করতে হচ্ছে, উড়ে এসে জুড়ে বসা ভূয়া 'আদিবাসিদের দাবীকে মানার জন্যে 'প্রকৃত আদিবাসি' জনগণ ও দেশের সংবিধানের কণ্ঠরোধ করতে বাধ্য হতে হচ্ছে। এইভাবে আমরা আমাদের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের নিরাপত্তা বিপন্ন করছি।

বাংলাদেশের উপর এই পরিস্থিতিগত বিপদ ছাড়াও আমাদের বাংলাদেশ রাষ্ট্রের ভূখন্ডগত স্বাতন্ত্র লাভের শুরু থেকেই আমাদের বড় প্রতিবেশীর প্রবল বৈরীতা আমাদের তাড়া করে ফিরছে। এই ভূখন্ড যখন পূর্ব পাকিস্তান ছিল, তখনও এ বৈরীতা ছিল। একাত্তরে আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধে সাহায্য করার পরও এই বৈরীতা তারা পরিত্যাগ করেনি। সাতচল্লিশের দেশ বিভাগ ভারত মেনে নিয়েছিল, কিন্তু পাকিস্তান টিকে থাকুক তা চায়নি। অনুরূপভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে তারা সাহায্য করেছে, তাদের বহু

সৈনিক জীবন দিয়েছে এ যুদ্ধে, কিন্তু তারা চায়নি যে, বাংলাদেশ প্রকৃতই এক স্বাধীন-সার্বভৌম দেশে পরিণত হোক। তারা আশা করেছিল, বাংলাদেশ সাতচল্লিশের দেশ বিভাগের দ্বিজাতিতত্ত্বের দর্শন পরিত্যাগ করবে, মুসলিম পরিচয়কে পেছনে ঠেলে দেবে, দেশ বিভাগ তাদের কাছে ধীরে ধীরে অস্বাভাবিক ও অযৌক্তিক হয়ে দাঁড়াবে এবং একদিন রাষ্ট্রীয় সীমানা তাদের কাছে খুব প্রয়োজনীয় বলে মনে হবে না। আমাদের যুদ্ধের সমাপ্তি এবং আমাদের স্বাধীনতার উষালগ্ন থেকেই এ ধরনের কথা তারা শুরুও করে দেয়। ১৯৭৩ সালে কলকাতায় প্রকাশিত A.T. Dev-এর ডিকশনারীতে দেয়া ম্যাপে বাংলাদেশকে ভারতের একটা প্রদেশ হিসাবে দেখানো হয়। সেই সময় কলকাতার দৈনিক অমৃতবাজার পত্রিকায় তৎকালীন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানকে 'The Chief Minister of Bangladesh' বলে অভিহিত করা হয়। কলকাতার বিখ্যাত দৈনিক Statesman তার Reunion of India শীর্ষক সম্পাদকীয় নিবন্ধে লিখে.....now is the time of work for a United States of India with the merger of this country Bangladesh and...." পরে কলকাতার আনন্দবাজার গ্রুপের ইংরাজী দৈনিক টেলিগ্রাফ Bangladesh are voting against partition with their feet' শীর্ষক সম্পাদকীয় নিবন্ধে লিখে, "পাকিস্তানকে প্রত্যাখ্যান করেছে তারা ১৯৭১ সালে। এখন দ্বিতীয়বার তারা প্রত্যাখ্যান করছে দেশ বিভাগকে। পাকিস্তান ছিল প্রথম স্বপ্ন, দ্বিতীয় স্বপ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছিল বাঙালী জাতীয়তাবাদ যা রূপ পেয়েছিল বাংলাদেশ রাষ্ট্রে। এই দ্বিতীয় স্বপ্ন বাংলাদেশকে তারা আজ প্রত্যাখ্যান করছে।"

টেলিগ্রাফ এর এ সম্পাদকীয়টি ছাপা হয় ১৯৯২ সালের ২৫ শে অক্টোবর সংখ্যায়। অর্থাৎ বাংলাদেশ রাষ্ট্রের শুরু থেকে বর্তমান পর্যন্ত বাংলাদেশের ব্যাপারে ভারতীয়রা একই ধারণা পোষণ করছে। সর্বশেষ ২০০৫ সালের ২৪ এপ্রিল নিউইয়র্কে উভয় বাংলার শিল্পীদের অনুষ্ঠানে ভারতীয় অভিনেতা চিরঞ্জীত চট্টোপাধ্যায় বলেন, "দুই বাংলার সীমানা মুছে ফেলতে হবে। সীমানা চিহ্ন থাকবে না। আমাদের ভাষা এক, সংস্কৃতি এক। আমরা একান্নবর্তি পরিবারের মতো বসবাস করতে চাই। এ স্বপ্ন আমাদের নেতারাও দেখতেন। এপার বাংলা ওপার বাংলা একাকার হতে এই অনুষ্ঠান দিয়ে যাত্রা শুরু হলো। অপেক্ষা করুন অদূর ভবিষ্যতেই সব দেখতে পাবেন।" ভারতীয়দের এই মানসিকতা স্বাধীনতা- উত্তরকালের সরকারের মধ্যেও প্রবেশ করেছিল। 'ইসলাম' ও 'মুসলিম' নামের উচ্ছেদ তারা এই সময় করেছিল। বিশ্ববিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয় হল, কলেজ, ইত্যাদির নাম থেকে 'ইসলাম' ও 'মুসলিম' শব্দ বাদ দেয়া হয়েছিল। বর্তমানে বাংলাদেশের অস্তিত্ববিরোধী বক্তব্য ও প্রচারণা আরও খোলামেলা হয়ে গেছে।

বাংলাদেশ রাষ্ট্র সম্পর্কে ভারতীয়দের এই মানসিকতা বাংলাদেশের রাষ্ট্রিক নিরাপত্তার জন্য সবচেয়ে বড় হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাদের এই মানসিকতার কারণেই যেন বাংলাদেশের সাথে কোনো সমস্যার সমাধানেই তারা আসছে না। বাংলাদেশকে

স্থায়ীভবে চাপের মধ্যে রেখে তাদের লক্ষ্য অর্জনের পথে অগ্রসর হওয়া তাদের একটা কৌশল হতে পারে। বাংলাদেশের ভেতরে অন্তর্ঘাত, বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বাংলাদেশ বিরোধী মনোভাব প্রমোট করা, ভেতর থেকে বাংলাদেশকে অকার্যকর করে তোলা এবং পরিশেষে হস্তক্ষেপ করা ভারতীয় এই লক্ষ্যের অংশ হতে পারে। কলকাতার আজকাল পত্রিকায় ২২, ২৩ ও ২৪ এপ্রিল, ১৯৮৯ তারিখে প্রকাশিত এক ধারাবাহিক রিপোর্টে এরই ইঙ্গিত রয়েছে। ভারতীয় অভিনেতা চিরঞ্জিত বাবুর 'অপেক্ষা করুন অদূর ভবিষ্যতেই সব দেখতে পাবেন' উক্তিটি একটা সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার দিকেই ইঙ্গিত করে।

**বাংলাদেশের নিরাপত্তা সমস্যা**

জাতীয় ঐক্য ও সংহতি একটা রাষ্ট্রের নিরাপত্তার জন্য অপরিহার্য। জাতির মধ্যে এই ঐক্য-সংহতি আসে জাতির বা রাষ্ট্রের উৎস, উদ্দেশ্য ও আদর্শের ঐক্য চেতনা থেকে। দুর্ভাগ্যের বিষয় হলো, অতি গুরুত্বপূর্ণ এই বিষয়েই আমাদের অজ্ঞতা সবচেয়ে বেশি। সাতচল্লিশে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল নিয়ে আলাদা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মূলে যে দর্শন কাজ করেছে, সেই দর্শনই আজকের স্বাধীন-সাবভৌম বাংলাদেশের স্বাতন্ত্র চেতনার ভিত্তি। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীনতার যে ঘোষণা দান করে, তাতেও ধারাহিকতা অক্ষুন্ন রেখে স্বাতন্ত্রচেতনার ভিত্তিকে সুরক্ষিত করা হয়েছে। শেখ মুজিবও পাকিস্তানের জেল থেকে দেশে ফেরার পর এই দৃষ্টিকোণ থেকেই বাংলাদেশকে দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র বলে অভিহিত করেন। পরে ভারতের চাপে সংবিধানে ধর্ম নিরপেক্ষতা সংযোজিত হলেও ১৯৭৫ সালে সিপাহী জনতার অভ্যুত্থানের মাধ্যমে জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় আসার পর জনগণের চাহিদা অনুসারে ধর্মনিরপেক্ষতাকে বিদায় দিয়ে সংবিধানের জনপ্রিয় চরিত্র আবার ফিরিয়ে আনা হয়। কিন্তু আওয়ামী লীগসহ দেশের ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী ও সমাজতন্ত্রী মহল ভারতীয় ইচ্ছার অনুসরণে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের স্বাতন্ত্র চেতনার দর্শনকে অস্বীকার করছে। এর বিকল্প হিসাবে বাংলাদেশের স্বাতন্ত্র চেতনা রক্ষার ভিত্তি কি হতে পারে, এ সম্পর্কে তাদের কোনো বক্তব্য নেই। তাদের বাঙালী জাতীয়তাবাদ বাংলাদেশ রাষ্ট্রের স্বাতন্ত্র রক্ষার ভিত্তি তো নয়ই, বরং এই জাতীয়তাবাদ ভারতের একটি প্রদেশ পশ্চিমবঙ্গের সাথে একাকার হয়ে যাবার একটি নিমিত্ত হতে পারে। কলকাতার চিরঞ্জীব চট্টপাধ্যায় তার উক্তিতে এবং টেলিগ্রাফ তার সম্পদকীয়তে এই একাকার হয়ে যাবার দিকেই ইঙ্গিত করেছে। ভারতীয়দের এই অভিলাস বোঝার ক্ষেত্রে অজ্ঞতাই আমাদের ধর্মনিরপেক্ষ ও সমাজতন্ত্রী রাজনীতিক, বুদ্ধিজীবীদের বিভ্রান্ত করছে। এই অজ্ঞতা দেশের নিরাপত্তার জন্য বিপজ্জনক। টমাস জেফারসন বলেছেন, 'কোনো জাতিই যুগপৎ' অজ্ঞ ও স্বাধীন ছিল না এবং তা থাকতেও পারে না (If a nation expects to be ignorant and free, it expects what never was and never will be)।' টমাস জেফারসন একটা পরম সত্য এখানে তুলে ধরেছেন। অজ্ঞতাকে পাপ বলা হয় এই জন্যই। অজ্ঞ নিজকেই চেনে না, রাষ্ট্রকে চিনবে কি করে? এই অজ্ঞতা দোষে দুষ্ট

আমাদের এক শ্রেণীর বুদ্ধিজীবী যে ডালে তাদের আশ্রয় সে ডালেরই গোড়া কাটছেন। এদের কারণেই জাতীয় ঐক্য সংহতি গড়ে উঠছে না। তাদের অজ্ঞতা জাতির অস্তিত্বকেই কুঠারাঘাত করছে। কেউ কেউ বলেন, তারা অজ্ঞ নয়, বিজ্ঞ। সেটা হলে তারা আরও বিপজ্জনক। সজ্ঞানভাবে রাষ্ট্রের স্বাতন্ত্র চেতনাকে অস্বীকার, রাষ্ট্রীয় নীতি-কার্যক্রমে মুসলিম পরিচয়ের প্রতি বৈরীতা এবং বাঙালী জাতীয়তার নামে চিরঞ্জীব বাবুদের টোপ গলধকরণকে ষড়যন্ত্রের অংশ বলা তাহলে যুক্তিযুক্ত হয়ে দাঁড়ায়। বাংলাদেশের নিরাপত্তার এটাই মৌলিক সমস্যা।

এছাড়া বিগত সরকারের আমলে আমাদের নিরাপত্তা সংকটের ক্ষেত্রে বহুমুখী ট্রানজিট নতুন বিষয় হিসেবে যোগ হয়েছে। ট্রানজিট অর্থনৈতিক বিষয় এই অর্থে যে, পণ্য এবং মানুষ ট্রানজিট সুযোগ ব্যবহার করে। কিন্তু ট্রানজিট দেয়া এবং না দেয়ার বিষয়টি অর্থনৈতিক নয়। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট দেশের নিরাপত্তা এবং পারস্পরিক আস্থা ও বিশ্বাসের সঙ্গে জড়িত। পারস্পরিক বিশ্বাস না থাকলে এবং নিরাপত্তা সংক্রান্ত ভীতি থাকলে কেনো দেশই ট্রানজিট বা করিডোর দিতে রাজি হয় না। ইউরোপেও পারস্পরিক ট্রানজিট হতে শুধু বছর নয় কয়েক শতাব্দী লেগেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত ইউরোপের দেশগুলো পারস্পরিক যুদ্ধ-বিদ্রোহ এবং দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মধ্যদিয়ে কাটিয়েছে। তখন ট্রানজিটের কথা কেউ চিন্তাও করেনি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী দ্বি-মাত্রিক পোলারাইজেশনের সময় পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলো তাদের কমন শত্রু কমিউনিস্ট ব্লকের বিরুদ্ধে শুধু একমত হওয়া নয় জোটবদ্ধ হয়ে যায়। এর মধ্যদিয়ে তাদের অর্থনৈতিক চিন্তার মধ্যে একটা ঐক্যমতের সৃস্টি হয়, তেমনি রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার ক্ষেত্রেও তারা এক প্লাটফর্মে এসে যায়। এরই ফল হলো ইউরোপীয় ট্রানজিট, করিডোর, ইত্যাদি। তবুও ইউরোপীয় দেশগুলোকে ট্রানজিটের সিদ্ধান্তে পৌঁছতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ২২ বছর অপেক্ষা করতে হয়। পারস্পরিক বিশ্বাস ও নিরাপত্তার ভীত পাকাপোক্ত করতে এই ২২ বছর সময় ব্যয় হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর যুদ্ধবিধ্বস্ত ইউরোপ কমিউনিস্ট ব্লকের হুমকির মুখে কমন নিরাপত্তার জন্য পরস্পরকে বিশ্বাস করে যেমন জোটবদ্ধ হয়।' তেমনি আর্থিক পুনর্গঠন ও প্রবৃদ্ধির জন্য প্রাথমিকভাবে TIR (International road Transit) চুক্তিতে আবদ্ধ হয় ১৯৪৯ সালে। প্রাথমিক এই TIR চুক্তি সফল হবার পর ১৯৫৯ সালে TIR কে আরো ব্যাপকভিত্তি করার জন্য তাদের TIR Convention হয়। এরও নয় বছর পর ১৯৬৮ সালে আজকের ইউরোপীয় ট্রানজিটের যাত্রা শুরু। এখানে উল্লেখ্য ১৯৬৮ সালের ট্রানজিট ১৯৫৯ সালের TIR Convention এবং ১৯৪৯ সালের TIR এগ্রিমেন্টের আগে ১৯৪৮ সালের ১৭ মার্চ পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলোর মধ্যে ন্যাটো সামরিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এর অর্থ ২য় বিশ্বযুদ্ধের পর ইউরোপীয় দেশগুলোর মধ্যে প্রথমে নিরাপত্তার ব্যাপারে কমন আস্থার সৃষ্টি হয়। আস্থা সৃষ্টির ক্ষেত্রে UNEC (United Nation Economic Commission) এর ভূমিকা ছিল। UNEC এর তত্তাবধানেই ইউরোপীয় ট্রানজিট আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। নিশ্চিত যে TIR এগ্রিমেন্টের সফলতাই

ইউরোপীয় দেশগুলোকে পরিপূর্ণ ট্রানজিটের দিকে নিয়ে যায়। কিন্তু ভারতের সাথে আমাদের দ্বি-পাক্ষিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে এমন ইতিবাচক কিছুই নেই। চুক্তি অনুসারে ভারতকে আমরা বেরুবাড়ি দিয়েছি ভারত আমাদেরকে তিনবিঘা করিডোর দেয়নি। দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে আমাদের বাণিজ্য ঘাটতি লাঘবের ক্ষেত্রে ভারত যত প্রতিশ্রুতি দিয়েছে তার কোনোটাই পূরণ হয়নি। বাংলাদেশের নদীগুলোর প্রাণহরণ করে ভারত আমাদের নদীর উজানে আড়াই-তিন ডজনের মতো বাঁধ দিয়েছে। সীমান্তে শান্তিরক্ষার কোনো চুক্তি, কোনো প্রতিশ্রুতিই অবস্থার উন্নয়ন ঘটায়নি। এ পর্যন্ত সীমান্তে কয়েক হাজার বাংলাদেশীকে হত্যা করা হয়েছে। এর মধ্যে নৃশংস হত্যাকাণ্ডও আছে। এই মে'মাসের শুরুর দিকে একজন বাংলাদেশীর পায়ুপথে পেট্রল ঢেলে হত্যা করা হয়েছে। শুধ দ্বি-পাক্ষিক নয় বহুপক্ষীয় চুক্তির ক্ষেত্রেও ভারত কোনো ইতিবাচক ভূমিকা পালন করেনি। অনেকেই মনে করেন ভারতের কারণে সার্ক আজ অকেজো। বিশেষ স্বার্থবাদিতার কারণেই সার্কের অধীনে SAPTA চুক্তি (South Asian Preferential Trade Agrement) কার্যকরী হয়নি। SAFTA (South Asian Free Trade Agrement) চুক্তিও কার্যকরী হতে পারছে না। ভারত আসলে দ্বি-পাক্ষিক ফ্রি-ট্রেড চায়। সার্কের অধীনে SAFTA-র মাধ্যমে বহুপক্ষীয় হিসেবে নয়। এই অবস্থার কারণেই ভারতরে সঙ্গে আমাদের কিংবা প্রতিবেশি কারোরই আস্থা ও বিশ্বাসের সম্পর্ক গড়ে ওঠতে পারেনি। আস্থা ও বিশ্বাস এবং নিরাপত্তার দিক বিবেচনা করা ছাড়া কেউ কাউকে ট্রানজিট কেন, বড় কোনো অর্থনৈতিক সম্পর্কও গড়ে তোলে না। ইউরোপ লিথুনিয়ার মধ্য দিয়ে রাশিয়াকে ট্রানজিট দিয়েছে ২০০২ সালে। এই ট্রানজিট অনেক পর্যবেক্ষণ, অনেক আলোচনার ফল। সবশেষে ভূ-রাজনৈতিক বিষয়ে উভয়পক্ষ পরস্পরের ওপর আস্থা আনার পর এর ওপর ভিত্তি করেই তারা ট্রানজিট এগ্রিমেন্টে পৌঁছে। এ সংক্রান্ত ডকুমেন্ট 'Kaliningrad transit of Goods: In Need for a strategic Approach to problem-solving' (East west institute) এ বলা হয়েছে, "There arrangements, although required view of the schenger system, were based on understanding of the unique geopolitical situation of the Kaliningrad oblast and did not inflict on the interests of lithuania and the European Union, When searching for a solution to the kaliningard transit of goods, the EU and Russia initially declared the same approach", সুতরাং দেখা যাচ্ছে নিরাপত্তা ও রাজনৈতিক বিষয়ের সমাধান ছাড়া কেউ কাউকে ট্রানজিট দেয় না।

সম্ভবত বাংলাদেশই একমাত্র ব্যতিক্রম। আমরা ট্রানজিট দেয়ার ক্ষেত্রে ট্রানজিটের Economics দেখছি, প্রতিপক্ষের চাহিদাকে দেখছি, কিন্তু পারস্পরিক আস্থা, বিশ্বাস ও নিরাপত্তার বিষয় দেখা হয়নি। ট্রানজিটের Economics এর অংক কষার দায়িত্ব দেয়া হয় বাণিজ্য মন্ত্রণালয়কে। বড় বড় দেশ এমনকি চীন, ভারত, আমেরিকার মতো

দেশও বিনিয়োগ ও ব্যবসায়িক লেনদেনের ক্ষেত্রে জাতীয় নিরাপত্তার দিকটা আগে বিবেচনা করে এবং বিষয়টিকে তাদের নিরাপত্তা কমিটি বিবেচনায় নিয়ে থাকে। সন্দেহ নেই আজকের দুনিয়ায় অর্থনৈতিক স্বার্থই সবচেয়ে বড় স্বার্থ। বড় বড় দেশের এই অর্থনৈতিক স্বার্থকে পাহারা দিচ্ছে তাদের রাজনৈতিক ও সামরিক শক্তি। কোথাও তাদের অর্থনৈতিক স্বার্থ বিপন্ন হলে সেখানে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ রাজনৈতিক ও সামরিক রক্তচক্ষু গিয়ে হাজির হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার তেল বা জ্বালানি স্বার্থকে তার জাতীয় নিরাপত্তার সাথে জড়িত বলে মনে করে। কোথাও এ স্বার্থ বিঘ্নিত হলে রাজনৈতিক ও কুটনৈতিক শক্তি যদি তার সমাধানে ব্যর্থ হয়, তাহলে যুদ্ধ বাধাতে সে এক মুহূর্তও দেরি করবে না। এটা আজকের দুনিয়ার অলিখিত এক কঠিন বাস্তবতা। এই বাস্তবতা সামনে রেখেই সচেতন দেশগুলো তাদের চেয়ে বড় দেশের সাথে অর্থনৈতিক সম্পর্ক স্থির করছে। বড় দেশ বা শক্তিশালী দেশগুলোর সাথে মুক্ত বাণিজ্যে যাওয়া বা বিনিয়োগ বা সাহায্য দেয়া-নেয়ার ক্ষেত্রে ছোট দেশগুলো জাতীয় নিরাপত্তার বিষয়টাকে সামনে রাখছে। সেই বড় দেশ প্রতিবেশী হলে সতর্কতা আরও বেশি বাড়ছে। খুব কাছের দেশ ভারতের দৃষ্টান্ত আমরা সামনে আনতে পারি। ভারত বিনিয়োগ ও সাহায্য-সহযোগিতা নেয়ার ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার ব্যাপারে যতোটা সতর্ক, তার চেয়ে শতগুণ বেশি সতর্ক চীনের সাথে অর্থনৈতিক সম্পর্ক গড়ার ক্ষেত্রে। ইউরোপ ও আমেরিকার ছোট ছোট দেশ থেকে ভারত বিলিয়ন বিলিয়ন ডলারের বিনিয়োগ নিচ্ছে এবং বিনিয়োগ করছে, কিন্তু ভারত প্রতিবেশী বড় দেশ চীনের সাথে এটা করছে না। বৃটিশ ম্যাগাজিন "The Economist" লিখছে" India.... sees its huge neighbour as a strategic threat. This makes it anxious about any influx of Chinese workers of investment that might have security implications" (The Economist, 28 Oct, 06) অর্থাৎ ভারত তার বিশাল প্রতিবেশী চীনকে কৌশলগত হুমকি মনে করে। এ জন্যে চীন থেকে জনশক্তি নেয়া কিংবা বিনিয়োগ নেয়ার ক্ষেত্রে নিরাপত্তা ঝুঁকির বিষয়কে সে সামনে রাখে। ছোট-খাট যে চীনা বিনিয়োগ ভারতে রয়েছে এবং চীনের যে জনশক্তি ভারতে কাজ করে, তারা বাড়তি বিধি-নিষেধের শিকার। Huawei Technologies নামের চীনের একটি টেলিফোন কোম্পানি ভারতের ব্যাঙ্গালোরে কাজ করে। এ ফার্মে ১১শ ৫০ জন ভারতীয় ইঞ্জিনিয়ার এবং মাত্র ৫০ জন চীনা ইঞ্জিনিয়ার কর্মরত ছিল। ২০০১ সালে ভারত অভিযোগ করে যে, এই কোম্পানির সাথে পাকিস্তান ও তালেবানদের যোগসূত্র আছে। সরকারি দরপত্রে অংশগ্রহণ এ কোম্পানির জন্যে নিষিদ্ধ করা হয়। চীনের অন্যান্য শিল্প-ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান, এ ধরনের নানা বিধি-নিষেধের শিকার। Hutchsion Port Holding হলো বন্দর নির্মাণ বিষয়ক সংস্থা। সম্প্রতি এই কোম্পানির জন্যে ভারতের একটি কনটেইনার পোর্ট প্রজেক্টের টেন্ডারে অংশগ্রহণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। চীন ও অন্য কিছু দেশের বিনিয়োগের উপর ভারতের এই নিয়ন্ত্রণ সাম্প্রতিককালে আরও জোরদার করা হয়েছে। "The Economist" লিখছে "So anxious, indeed, that it is

considering formlisaing its existing unwritten controls on investment from China and other countries” সন্দেহ নেই, নিরাপত্তা উদ্বেগের কারণেই ভারত চীন ও অন্যান্য দেশের বিনিয়োগের উপর তার অলিখিত নিয়ন্ত্রণকে আনুষ্ঠানিক রূপ দিতে চাচ্ছে। The Economist- এ ব্যাপারে আরও লিখেছেঃ Among the measures being considered by Indias National Security Council, which has been charged with drafting a National Security Exception Act, is a plan to subject proposed investment from, perhaps, China, Taiwan, Pakistan, North Korea and Middle Eastern countries to special examination.” (The Economist, Oct, 28, 06) অর্থাৎ বিদেশী বিনিয়োগ-ব্যবসার ব্যাপারে নিরাপত্তা বিষয়ক বিধি-ব্যবস্থা প্রণয়ন করছে ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদ। তারা ‘National Security Exception Act নামে একটা আইন তৈরি করছে। পরিকল্পনা অনুযায়ী চীন, তাইওয়ান, পাকিস্তান, উত্তর কোরিয়া এবং মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর বিনিয়োগ বিশেষ বিচার বিবেচনার মুখোমুখি হবে।

সুতরাং আজকের বিশ্বপরিস্থিতির অর্থনৈতিক সম্পর্ক শুধু অর্থনৈতিক বিষয় নয়, এর সাথে নিরাপত্তার প্রশ্নও জড়িত হয়ে পড়েছে। বিশেষ করে প্রতিবেশী দেশ তার বড় প্রতিবেশী দেশের বিনিয়োগ ও সাহায্য এই নিরাপত্তার প্রশ্ন সামনে নিয়ে আসছে, যেমন করে চীনের ব্যাপারে ভারত নিরাপত্তার প্রশ্ন বিবেচনা করছে। ঠিক তেমনিভাবে ভারতের ব্যাপারে বাংলাদেশকে নিরাপত্তার প্রশ্ন অবশ্যই সামনে আনা উচিত। চীনের সাথে ভারতের প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্পর্ক। দু'দেশই আঞ্চলিক পরাশক্তি। দু'দেশের লক্ষ্য হলো একে অপরকে ছাড়িয়ে যাওয়ার কিংবা একে অন্যকে ছাড়িয়ে যেতে না দেয়ার। এটা বলা যায়, দুই সমানের দ্বন্দ্ব। কিন্তু ভারতের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক হলো দুই অসমানের। অসমান হওয়া কোন সমস্যা নয়। কিন্তু এর সাথে যুক্ত রয়েছে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে ভয় ও অবিশ্বাসের এক ঐতিহ্যিক সম্পর্ক। এর পেছনে রয়েছে দেশ বিভাগের ইতিহাসও। ভারত রাষ্ট্রের প্রণেতারা অখন্ড ভারতের পক্ষে ছিল। আর বাংলাদেশ স্বতন্ত্র রাষ্ট্র চিন্তার উত্তরাধিকার। ভারতের রাজনীতি, ভারতের মিডিয়া এই ইতিহাস ভোলেনি, সুযোগ পেলেই স্মরণ করিয়ে দেয়। এই কারণে বাংলাদেশও ভুলতে পারেনি। ভুলতে পারছে না এখনও এই কথা যে, বাংলাদেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের প্রতি ভারতীয় রাজনীতির বৈরিতা না হোক, সংগোপন বিতৃষ্ণা আছে। গত কয়েক দশক ধরে দুই দেশের দ্বিপাক্ষিক সমস্যা ও সম্পর্কের ক্ষেত্রে ভারতীয় এই মনোভাবের প্রকাশ ঘটেছে। এর ফলেই ভারতের সাথে বাংলাদেশের ভালোবাসার বদলে ভয়ের সম্পর্ক সৃষ্টি হয়েছে। চীনের সাথে ভারতের সম্পর্ক বেশি স্পর্শকাতর। চীনা বিনিয়োগ নেয়ার ক্ষেত্রে ভারত যে নিরাপত্তা চিন্তা করে, সেই ধরনের নিরাপত্তা চিন্তা বাংলাদেশকে আরও বেশি করতে হবে ভারতের সাথে অর্থনৈতিক ও ট্রানজিটের মত সম্পর্ক গড়ার ক্ষেত্রে। (চলবে)

৩০ নং পৃষ্ঠায়

মীম ট্যুরস বিজ্ঞাপন

# নারী নির্যাতনের বিভিন্ন রূপ : ইসলামে তার প্রতিকার

ড. মো: ছামিউল হক ফারুকী

মানব সৃষ্টির সূচনা থেকেই পুরুষের পাশে নারীর অবস্থান ছিল অপরিহার্য। এককভাবে নারী বা এককভাবে পুরুষের অস্তিত্বই কল্পনা করা যায় না। মানব সমাজের অস্তিত্ব, স্থিতি ও ক্রমবিকাশের জন্য পুরুষের সাথে নারীর সহাবস্থান অপরিহার্য। আল্লাহ তা'আলা আল কুরআনে বলেন,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً

'হে মানবমণ্ডলী! তোমরা ভয় করো তোমাদের রবকে, যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন একটিমাত্র প্রাণ থেকে এবং সে প্রাণ থেকে সৃষ্টি করেছেন তার জোড়াকে; আর এ দু'জনের মধ্যমে ছড়িয়ে দিয়েছেন বহু পুরুষ ও নারী।" (৪, সূরা আন্‌নিসা : ১)

কিন্তু এতদ্‌স্বত্ত্বেও নারী সমাজের প্রতি অন্যায় অবিচার আদিকাল থেকেই চলে আসছে। এমনকি নারীদের মধ্যে মানবাত্মা আছে কিনা, তা নিয়েই ইহুদী-খৃস্টান পণ্ডিতরা ঘোরতর মতভেদে লিপ্ত ছিলেন। নারীদেরকে দাসী-বাদীর মতো ব্যবহার করা হতো এবং ভোগের বস্তু মনে করা হতো। এমতাবস্থায় ইসলাম তাদেরকে মানুষ হিসেবে পুরুষের মতো সমমর্যাদাসম্পন্ন বলে ঘোষণা করেছে। ইসলাম তাদেরকে পরিপূর্ণ সামাজিক মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছে এবং তারা যে সমাজের দায়িত্বশীল ও অপরিহার্য অংশ এবং তারা ছাড়া যে সমাজ সংসারের অস্তিত্বই কল্পনা করা যায় না, তা বুঝিয়ে দিয়েছে।

কিন্তু একদল স্বার্থবাদী মানুষ ইসলামের বিধানকে পরিহার করে নারীদের মর্যাদা ও নিরাপত্তাকে বারবার বিঘ্নিত করেছে। আইয়ামে জাহিলিয়াত (জাহেলী যুগ) ছিল এর নিকৃষ্টতম উদাহরণ। সেখানে নারীদের মর্যাদা দেওয়াতো দূরের কথা, তাদের অস্তিত্বকেই হুমকির মুখে ফেলে দেওয়া হয়েছিল। সে যুগে নারীদের অবস্থা এতোটাই খারাপ ছিল যে, তাদের জন্মকে অপমানের কারণ মনে করা হতো এবং কন্যা সন্তানদেরকে নির্দয়ভাবে হত্যা করা হতো। নারীদের অস্তিত্বকেই যেখানে নিজেদের জন্য অপমানকর মনে করা হতো, সেখানে তাদের মর্যাদা ও অধিকারের কথা কল্পনাই করা যায় না।

জাহেলী যুগে নারীর মর্যাদা গৃহের অন্যান্য আসবাবপত্রের চেয়ে বেশী ছিল না। সেসময় চতুস্পদ জীব-জন্তুর ন্যায় তাদেরও বেচা-কেনা হতো। নিজেদের বিয়ে-শাদীর ব্যাপারেও নারীর মতামতের কোনো মূল্য ছিল না; অভিভাবকগণ যার দায়িত্বে অর্পণ করতো, তাদেরকে সেখানেই যেতে হতো। নারী তার আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পদে উত্তরাধিকারী হতে পারতো না। তাদেরকে মনে করা হতো পুরুষের স্বত্বাধীন।

কোনো জিনিসেই তাদের নিজস্ব কোনো স্বত্ব ছিল না। আর যা কিছু নারীর স্বত্বাধীন ছিল তাও পুরুষের অনুমতি ছাড়া ভোগ-দখলের অধিকার ছিল না। ইউরোপের যে সব দেশকে আধুনিক বিশ্বের সর্বাধিক সভ্য দেশ হিসেবে গণ্য করা হয়, সেসব দেশে এমন লোকও ছিল, যারা নারীর মানব স্বত্বাকেই স্বীকার করতো না।

ধর্ম-কর্মে নারীদের কোনো অংশ ছিল না। তাদেরকে ‘ইবাদাত-উপাসনা বা জান্নাতের যোগ্যও মনে করা হতো না। এমন কি রোমের কোনো কোনো সংসদে পারস্পরিক পরামর্শক্রমে সাব্যস্ত করা হয়েছিল যে, এরা হলো অপবিত্র জানোয়ার, যাতে আত্মার অস্তিত্ব নেই। পিতার জন্য কন্যাকে হত্যা করা কিংবা জীবিত কবর দেওয়াকে কৌলিন্যের নিরিখ বলে মনে করা হতো। অনেকের ধারনা ছিল, নারীকে কেউ হত্যা করলে হত্যাকারীর উপর মৃত্যুদন্ড বা  খুনের বদলা কোনোটাই আবশ্যক হবে না। কোনো কোনো জাতির প্রচলিত রীতি অনুযায়ী স্বামীর মৃত্যু হলে স্ত্রীকেও তার চিতায় জ্বলে মরতে হতো। ৫৮৬ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসীরা বহু বিরোধিতা স্বত্বেও এ প্রস্তাব পাশ করে যে, নারী প্রাণি হিসেবে মানুষ বটে, কিন্তু শুধুমাত্র পুরুষের সেবার জন্যই তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে।

মোট কথা সারা বিশ্ব এবং সকল ধর্ম নারী সমাজের সাথে যে আচরণ করেছে, তা অত্যন্ত হৃদয়বিদারক ও লোমহর্ষক। ইসলামের পূর্বে সৃষ্টির এ অংশ ছিল অত্যন্ত অসহায়।

জাহিলী যুগে নারীদের অবস্থা এতটাই সূচনীয় ছিল যে, লোক লজ্জা ও অপমানের ভয়ে কন্যা সন্তানদেরকে হত্যা ও জীবন্ত ভূগর্ভে প্রোথিত করে ফেলতো। স্ত্রীর প্রসবকাল ঘনিয়ে আসলে নরাধম স্বামী পূর্ব হতেই দূরবর্তি প্রান্তরে গর্ত খুড়ে রাখতো এবং মাকে ধোকা দিয়ে কন্যাকে নিয়ে সে গর্তে ফেলে দিত। তারপর উপর হতে পাথর নিক্ষেপ করে তার মস্তক চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিত। আতংকে আড়ষ্ট শিশুকন্যা বাবা বাবা বলে আর্তনাদ করছে, আর পশ্বাধম পিতা উপর থেকে পাথর নিক্ষেপ করে তার মস্তক চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেলছে, এমন মর্মবিদারক অনেক ঘটনার বিবরণ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। আল কুরআনে এর বর্ণনা দিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ - يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ

“যখন তাদের কাউকে কন্যা সন্তানের সুসংবাদ দেওয়া হয়, তখন তার মুখ কাল হয়ে যায় এবং সে দু:খ ভারাক্রান্ত হয়ে পরে। তাকে যে সুসংবাদ দেওয়া হয় সে দু:খে লোকদের থেকে সে মুখ লুকিয়ে রাখে। সে ভাবে অপমান সহ্য করে একে রাখবে না কি মাটিতে পুঁতে ফেলবে। জেনে রাখ, তাদের ফয়সালা অতি নিকৃষ্ট।” (১৬-সূরা আন নাহল : ৫৮-৫৯)

ইসলাম এ শোচনীয় অবস্থা থেকে নারীদেরকে মুক্ত করে লাঞ্ছনার গহ্বর থেকে তুলে মর্যাদার শীর্ষে আরোহণ করিয়েছে এবং পুরুষদের মত নারীদেরকেও সামাজিক, ধর্মীয় ও অর্থনৈতিক অধিকার দিয়েছে। ইসলাম কন্যা সন্তান হত্যাকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ

করেছে এবং  এটিকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে গণ্য করেছে। আল কুরআনে বলা হয়েছে,

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

"তোমাদের সন্তানদেরকে অভাবের ভয়ে হত্যা করো না। আমিই তাদের এবং তোমাদের জীবিকার ব্যবস্থা করি। নিঃসন্দেহে তাদের হত্যা করা মহাপাপ।"

وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ – بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ

"যখন জীবিত পুঁতে ফেলা মেয়েকে জিজ্ঞেস করা হবে, কোন্ অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছে?" (৮১, সূরা আত্ তাকভীর : ৮-৯)

ইসলামই বিশ্ববাসীর চোখের পর্দা উন্মোচন করেছে। নারীদেরকে মর্যাদা দান করেছে এবং তাদের অধিকার সংরক্ষণ পুরুষদের জন্য অত্যাবশ্যক করেছে। বিয়ে-শাদী ও ধন-সম্পদে তাদের অধিকার দেওয়া হয়েছে। এমন কি পিতাও প্রাপ্তবয়স্কা নারীকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিয়েতে বাধ্য করতে পারবে না। এমন কি নারীকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিয়ে দিলেও তা তার অনুমতির উপর স্থগিত থাকে; সে অস্বীকৃতি জানালে তা বাতিল হয়ে যায়। তার সম্পদে কোনো পুরুষ-ই তার অনুমতি ছাড়া হস্তক্ষেপ করতে পারেনা। স্বামীর মৃত্যু বা স্বামী তাকে তালাক দিলে কেউ তাকে কোনো ব্যাপারে বাধ্য করতে পারে না। স্বামী তার ন্যায্য অধিকার না দিলে সে আইনের সাহায্যে তা আদায় করে নিতে পারে অথবা আইনের মাধ্যমে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটাতে পারে। সেও তার পিতা-মাতা বা নিকটাত্মীয়ের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে তেমনি অংশীদার হয়, যেমন হয় পুরুষরা।

নারী নিগ্রহের অন্যতম কারণ হলো একদল পথভ্রষ্ট ও উচ্ছৃঙ্খল লোকের দুষ্ট প্রবৃত্তি। নীতি নৈতিকতা ও শালীনতা বিবর্জিত এ চক্রটি তাদের কুপ্রবৃত্তির লালসা পুরণের জন্য নারীদের সাথে অবাধ মেলামেশার পরিবেশ তৈরিতে সদা সচেষ্ট। এদের প্ররোচনায় প্রলুব্ধ হয়েই একশ্রেণীর নারী উচ্ছৃঙ্খলতায় গা ভাসিয়ে দেয়। এরা যে মোড়কে তাদের প্রচারণা চালায় তা হলো নারী অধিকার, নারী স্বাধীনতা, আধুনিকতা ও প্রগতিবাদিতা ইত্যাদি। এসকল চকটদার শ্লোগানে এক শ্রেণীর নারীকে বিভ্রান্ত করে নানান কায়দায় তাদেরকে হেনস্তা ও হয়রানি করছে পশ্চিমা মানসিকতার গোলাম একশ্রেণীর উদ্ভ্রান্ত মানুষ। আরেক শ্রেণীর মানুষ ইসলাম নারীকে যে সম্মান ও অধিকার দিয়েছে তা না বোঝার কারণে নারীদেরকে অসম্মান ও অধিকার বঞ্চিত করছে। আবার নারী সমাজের একটি অংশও ইসলামের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে গিয়ে নানাবিধ অপস্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়ে নিজেদেরকে হেয় ও লাঞ্ছিত করছে। ইসলাম এ সবকিছু থেকেই নারীদের পরিত্রাণের ব্যবস্থা করেছে।

## ইসলামে নারীর সামাজিক মর্যাদা

ইসলাম মানুষ হিসেবে ও সামাজিকভাবে নারী এবং পুরুষ উভয়কে সমান মর্যাদা দিয়েছে। আল্লাহ তা'আলা তাদের উভয়কেই মানব জাতির উৎস হিসেবে উল্লেখ

করেছেন। আল কুরআনে এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا

"হে লোক সকল, নিশ্চয় আমি তোমাদেরকে একজন নারী ও একজন পুরুষ থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বংশ ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা পরস্পরে পরিচিত হতে পার।" (৪৯, সূরা আল হুজুরাত : ১৩)

মানব জাতির উৎসস্থল যেমন সমানভাবে নারী ও পুরুষ, তেমনি নারী এবং পুরুষ উভয়ই একই উৎস থেকে উৎসারিত। সুতরাং ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষ হিসেবে নারী-পুরুষের মর্যাদার কোনো তারতম্য নেই।

দায়িত্ব ও অধিকারের ক্ষেত্রেও ইসলাম নারী-পুরুষের সমান মর্যাদা দিয়েছে। আল কুরআনে বলা হয়েছে,

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

"তাদের (স্ত্রীদের) উপর যেমন তোমাদের অধিকার রয়েছে, তোমাদের উপরও তাদের অনুরূপ ন্যায়সংগত অধিকার রয়েছে।" (২, সূরা আল বাকারা : ২২৮)

জাহেলী যুগে লোকেরা নিজেদেরকে স্ত্রীদের মালিক মনে করত। ফলে অধিনস্ত মনে করে তাদের সাথে অসদাচরণ করত। ইসলাম স্ত্রীকে বন্ধুর মর্যাদা দিয়েছে এবং তাদের সাথে সদাচারের নির্দেশ দিয়েছে। আল কুরআনে বলা হয়েছে, وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ "তোমরা তাদের (স্ত্রীদের) সাথে ভদ্রভাবে বসবাস করো।" (৪, সূরা আন্‌নিসা : ১৯)

ইসলাম জ্ঞান অর্জন, জ্ঞান চর্চা ও ধর্মকর্মে পুরুষের ন্যায় নারীকেও সমান সুযোগ ও অধিকার দিয়েছে। নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ. "জ্ঞান অন্বেষণ করা সকল মুসলিমের (নর-নারী সকলের) উপর ফরজ।"[১]

ইসলামের 'ইবাদাত-বন্দেগী-সালাত, সাউম, যাকাত, হজ্জ, কুরআন-হাদীস অধ্যয়ন প্রভৃতিতে নারী-পুরুষে কোনো প্রভেদ করা হয়নি।

জাহেলী যুগে যে কন্যা সন্তানকে লজ্জা ও অপমানের কারণ মনে করা হতো এবং সে অপমান ও লজ্জা থেকে বাঁচার জন্য কন্যা সন্তানকে হত্যা করে ফেলা হতো, ইসলাম সেই কন্যাকে সম্মান ও সৌভাগ্যের কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছে। এ প্রসঙ্গে হাদীছে এসেছে,

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: دَخَلَتِ امْرَأَةٌ مَعَهَا ابْنَتَانِ لَهَا تَسْأَلُ، فَلَمْ تَجِدْ عِنْدِي شَيْئًا غَيْرَ تَمْرَةٍ، فَأَعْطَيْتُهَا إِيَّاهَا، فَقَسَمَتْهَا بَيْنَ ابْنَتَيْهَا، وَلَمْ تَأْكُلْ مِنْهَا، ثُمَّ قَامَتْ، فَخَرَجَتْ، فَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْنَا، فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ: «مَنِ ابْتُلِيَ مِنْ هَذِهِ الْبَنَاتِ بِشَيْءٍ كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّارِ»

'আয়িশা (রা.) বর্ণনা করেন, আমার নিকট একজন মহিলা আসল, যার সাথে দু'টি

---

১. ইবন মাজাহ, হাদীছ নং ২২৪।

কন্যাও ছিল। সে আমার কাছে কিছু চাইল, কিন্তু একটি খেজুর ছাড়া আমার কাছে আর কিছু পেল না। আমি সেটি তাকে দিলে সে তা দু'কন্যার মধ্যে ভাগ করে দিল। অত:পর উঠে চলে গেল। এরপর নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রবেশ করলে আমি তাকে ঘটনাটি বর্ণনা করলাম। তখন তিনি বললেন, "এ মেয়েদের মাধ্যমে যে ব্যক্তিকে পরীক্ষার সম্মুখীন করা হয়, অত:পর সে তাদের প্রতি সুন্দর আচরণ করে, তারা তার জন্য জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা পাওয়ার কারণ হবে।"[২]

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ –ﷺ– مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ حَتَّى تَبْلُغَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَا وَهُوَ. وَضَمَّ أَصَابِعَهُ.

আনাস ইবন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,"যে ব্যক্তি দু'জন মেয়ে লালনপালন করে, যতক্ষণ না বয়:প্রাপ্ত হয়, সে কিয়ামতের দিন আমার সাথে এভাবে আসবে। এ কথা বলে তিনি নিজের আঙ্গুলগুলো একত্রিত করে দেখান।"[৩]

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ –ﷺ– مَنْ كَانَتْ لَهُ أُنْثَى فَلَمْ يَئِدْهَا وَلَمْ يُهِنْهَا وَلَمْ يُؤْثِرْ وَلَدَهُ عَلَيْهَا – أَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ

ইবন 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তির কন্যা সন্তান আছে, সে যদি তাকে জীবন্ত কবর না দেয়, তাকে লাঞ্ছিত ও অবহেলিত অবস্থায় না রাখে এবং পুত্রকে তার উপর অগ্রাধিকার না দেয়, তাহলে আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।"[৪]

عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ كَانَ لَهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ فَصَبَرَ عَلَيْهِنَّ، وَأَطْعَمَهُنَّ، وَسَقَاهُنَّ، وَكَسَاهُنَّ مِنْ جِدَتِهِ كُنَّ لَهُ حِجَابًا مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

'উকবা ইবন 'আমির (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, "যার তিন জন কন্যা আছে, সে যদি তাদের জন্য ধৈর্য ধারণ করে এবং তার সামর্থ অনুযায়ী তাদেরকে খাওয়ায়, পান করায় এবং পোষাক পরিধান করায়, তাহলে তারা তার জন্য জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষার কারণ হবে।"[৫]

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنْ رَجُلٍ تُدْرِكُ لَهُ ابْنَتَانِ، فَيُحْسِنُ إِلَيْهِمَا مَا صَحِبَتَاهُ – أَوْ صَحِبَهُمَا – إِلَّا أَدْخَلَتَاهُ الْجَنَّةَ

শুরাহবিল বলেন, আমি ইবন 'আব্বাস (রা.) কে নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম

---

২. বুখারী, কিতাবুয্ যাকাত, বাবু ইত্তাকুন নারা ওয়া লাউ বিশিক্বি তামারাতিন ওয়া কালিলিম মিনাস সাদাকা, হাদীছ নং, ১৪১৮ ও ৫৯৯৫; মুসলিম, কিতাবুল বিররি ওয়াস সিলাহ ওয়াল আদাব, বাবু ফাজলিল ইহসান ইলাল বানাত, হাদীছ নং ২৬২৯।

৩. মুসলিম, প্রাগুক্ত, হাদীছ নং ২৬৩১।

৪. আবু দাউদ, কিতাবুল আদাব, বাবু ফি ফাজলি মান 'আলা ইয়াতামা, হাদীছ নং ৫১৪৬।

৫. ইবন মাজাহ, কিতাবুল আদাব, বাব, বিররুল ওয়ালিদি ওয়াল হুসনি ইলাল বানাত হাদীছ নং ৩৬৬৯, মুসনাদের আহমদ, হাদীছ নং ১৭৪০৩।

থেকে বর্ণনা করতে শুনেছি, তিনি বলেন, "যে মুসলিমের দু'টি মেয়ে থাকবে, সে যদি তাদেরকে ভালভাবে রাখে, তাহলে তারা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে।"[৬]

**عَنْ سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكٍ، يَقُولُ: أَنَّهُ حَدَّثَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ: يَا سُرَاقَةُ، أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى أَعْظَمِ الصَّدَقَةِ أَوْ مِنْ أَعْظَمِ الصَّدَقَةِ؟ قَالَ: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: ابْنَتُكَ مَرْدُودَةٌ إِلَيْكَ، لَيْسَ لَهَا كَاسِبٌ غَيْرَكَ.**

সুরাকা ইবন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বর্ণনা করেন যে, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বলেন, সুরাকা আমি কি তোমাকে সবচেয়ে বড় সাদকা অথবা বড় সাদকাগুলোর অন্যতম সাদকা কি তা বলব? সুরাকা বললেন, হ্যাঁ, অবশ্যই হে আল্লাহর রাসূল। তিনি বললেন, তোমার যে মেয়ে (তালাক প্রাপ্তা বা বিধাব হয়ে) তোমার নিকট ফিরে আসে এবং তুমি ছাড়া তার আর কোন উপার্জনকারী নেই (তাদের ভরণ-পোষণ করা)।"[৭]

**عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ آوَى يَتِيمًا إِلَى طَعَامِهِ وَشَرَابِهِ، أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ الْجَنَّةَ الْبَتَّةَ، وَمَنْ عَالَ ثَلاثَ بَنَاتٍ أَوْ مِثْلَهُنَّ مِنَ الأَخَوَاتِ، فَأَدَّبَهُنَّ وَرَحِمَهُنَّ حَتَّى يُغْنِيَهُنَّ اللَّهُ، أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ الْجَنَّةَ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَوِ اثْنَتَيْنِ؟ قَالَ: أَوِ اثْنَتَيْنِ، حَتَّى لَوْ قَالُوا: وَوَاحِدَةً، لَقَالَ: وَاحِدَةً،**

"ইবন 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি ইয়াতিমকে খাবার ও পানীয়ের ব্যবস্থা করে, আল্লাহ অবশ্যই তার জন্য জান্নাত অবধারিত করে দেবেন। আর যে ব্যক্তি তিনজন কন্যা বা অনুরূপ সংখ্যক বোনের লালন পালন করে, তাদেরকে আদব-কায়দা শিক্ষা দেয় এবং তাদের সাথে স্নেহপূর্ণ আচরণ করে, যতক্ষণ না আল্লাহ তাদেরকে মুখাপেক্ষিহীন করে দেন, তার জন্য আল্লাহ জান্নাত অবধারিত করে দেন। এক ব্যক্তি বলল, আর যদি দু'জন হয়? তিনি বললেন, দু'জন হলেও তাই হবে। হাদীসের বর্ণনাকারী বলেন, লোকেরা যদি বলত, আর যদি একজন হয়? তাহলে তিনি বলতেন, একজন হলেও।"[৮]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম পিতা-মাতার দেখাশুনা ও আচরণের ক্ষেত্রে মাতাকে পিতার তিনগুণ অধিকার দিয়েছেন।

**عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي؟ قَالَ: أُمُّكَ قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: ثُمَّ أُمُّكَ قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: ثُمَّ أُمُّك» قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: ثُمَّ أَبُوكَ**

---

৬. মুসনাদে আহমাদ, হাদীছ নং ৩৪২৪, বুখারী আদাবুল মুফরাদ, হাদীছ নং ৭৭, ইবন মাজাহ, প্রাগুক্ত, হাদীছ নং ৩৬৭০।

৭. মুসনাদে আহমাদ, হাদীছ নং ১৭৫৮৬, বুখারী আদাবুল মুফরাদ, হাদীছ নং ৪০, ইবন মাজাহ, প্রাগুক্ত হাদীছ নং ৩৬৬৭।

৮. বগবী, শারহুস্ সুন্নাহ, বাবু ছাওয়াবি কাফিলিল ইয়াতিম, হাদীছ নং ৩৪৫৭

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল (সা.), লোকদের মধ্যে আমার সদাচারের সর্বাধিক অধিকারী কে? তিনি বললেন, তোমার মা। সে বলল, তারপর কে? তিনি বললেন, তোমার মা। লোকটি বলল, তারপর কে? তিনি বললেন, তোমার মা। সে আবার বলল, তারপর কে? তিনি বললেন, তারপর তোমার পিতা।[৯]

**ধর্ষণ, বেশ্যাবৃত্তি নিষিদ্ধ**

যুগে যুগেই নারীদেরকে যৌন হয়রানী করা হতো। নারীদেরকে বিভিন্নভাবে হেনস্থা করা, ইভ টিজিং, জোরপূর্বক ধর্ষণ, বেশ্যাবৃত্তিতে বাধ্য করা প্রভৃতি সর্বকালেই ছিল। বর্তমানে এগুলো ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। ইসলাম এ সকল যৌন হয়রানী থেকে নারীদেরকে নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছে। যারা নারীদেরকে জোরপূর্বক ধর্ষণ করে অথবা কোনো নারী পুরুষ যদি যেনা-ব্যভিচারে লিপ্ত হয়, তাহলে ইসলাম তাদেরকে কঠোর শাস্তির আওতায় এনেছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

**وَ لَا تُكْرِهُوا فَتَيٰتِكُمْ على الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَ مَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ**

আর তোমাদের বাঁদীরা যখন নিজেরাই সতী সাধ্বী থাকতে চায়, তখন দুনিয়াবী স্বার্থলাভের উদ্দেশ্যে তাদেরকে বেশ্যাবৃত্তিতে বাধ্য করো না। তবে যদি কোনো ব্যক্তি তাদেরকে বাধ্য করে, তবে এ জোর-জবরদস্তির পর আল্লাহ তাদের জন্য ক্ষমাশীল ও করুণাময়। (২৪, সূরা আন্নূর : ৩৩)।

ধর্ষক ও যিনাকরীদের কঠিন শাস্তির আওতায় আনা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল কুরআনে আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

**الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ**

ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী উভয়ের প্রত্যেককে এক শত বেত্রাঘাত করো। আর আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে তাদের প্রতি কোন মমত্ববোধ ও করুণা যেন তোমাদের মধ্যে না জাগে, যদি তোমরা আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান এনে থাক। আর তাদেরকে শাস্তি দেবার সময় মু’মিনদের একটি দল যেন উপস্থিত থাকে। (২৪, সূরা আন্নূর : ২-৩)

অবিবাহিত নারী-পুরুষ যিনা করলে তাদের জন্য এ শাস্তি। কিন্তু যিনাকারী নারী-পুরুষ যদি বিবাহিত হয়, তাহলে তাদের শাস্তি মৃত্যুদন্ড, যা পাথর মেরে কার্যকর করতে হবে।

**অপবাদ দেওয়ার শাস্তি**

---

৯. বুখারী, কিতাবুল আদাব, বাবু মান আহাক্কুন নাসি বি হুসনিস সুহবাহ, হাদীছ নং ৫৯৭১, মুসলিম: কিতাবুল বিররি ওয়াস সিলাতি ওয়াল আদাব, বাব, বিররুল ওয়ালিদাইনি ও আন্নাহুমা আহাক্কু বিহি, হাদীছনং ২৫৪৮।

নারী নির্যাতনের আরেকটি দিক হলো তাদেরকে ব্যভিচারের মিথ্যা অপবাদ দেওয়া। এর মাধ্যমে নারীদেরকে চরম অপদস্ত ও তাদের সামাজিক সম্মান ক্ষুন্ন করা হয়। ইসলাম এটিকে চূড়ান্তভাবে নিষিদ্ধ করেছে এবং এ ধরনের অপবাদ আরোপকারীকে চরম শাস্তির আওতায় এনেছে। এ ব্যাপারে আল্‌কুরআনের বিধান হলো,

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

আর যারা সতী-সাধ্বী নারীর ওপর যিনার অপবাদ আরোপ করে, তারপর চারজন সাক্ষী আনে না, তাদেরকে আশিটি বেত্রাঘাত করো এবং তাদের সাক্ষ্য কখনো গ্রহণ করো না। আর তারা হলো ফাসিক। (২৪, সূরা আন্‌নূর : ৪)

إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

যারা সতী সাধ্বী, সরলমনা মু'মিন মহিলাদের প্রতি যিনার অপবাদ দেয়, তারা দুনিয়া ও আখিরাতে অভিশপ্ত এবং তাদের জন্য রয়েছে বিরাট শাস্তি। (২৪, সূরা আন্‌নূর : ২৩)

**৫. যৌতুক নিষিদ্ধ, মাহরের ব্যবস্থা**

কোনো পুরুষ কোনো নারীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে চাইলে, ইসলাম পুরুষের উপর একটি নির্দিষ্ট অংকের অর্থ বিবাহের মাহর হিসেবে প্রদান করা আবশ্যক করে দিয়েছে। আল্লাহ তা'আলা এ প্রসঙ্গে বলেন,

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

আরও (হারাম করা হলো) বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ নারীদেরকে; তবে তোমাদের দক্ষিণ হস্ত যাদের অধিকারী হয়েছে তারা ব্যতীত। এটা তোমাদের জন্য আল্লাহর অবধারিত নির্দেশ। এছাড়া অন্য নারীদেরকে (বিয়ে করা) তোমাদের জন্য হালাল করা হলো এ শর্তে যে, অর্থের (মাহরের) বিনিময়ে তাদেরকে স্ত্রী হিসেবে পাওয়ার চেষ্টা করবে, শুধু যৌন লালসা চরিতার্থ করার জন্য নয়। আর তাদের দ্বারা তোমরা যে উপকার লাভ করছ, নির্ধারণ অনুযায়ী তাদের বিনিময় (মাহর) দিয়ে দেবে। তবে মোহরানা নির্ধারিত হওয়ার পর পারস্পরিক সম্মতিতে তোমাদের মধ্যে যদি কোন সমঝোতা হয়ে যায়, তাহলে তাতে কোন দোষ নেই। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময়। (৪, সূরা আন্‌নিসা : ২৪)

وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

আর সন্তুষ্ট চিত্তে স্ত্রীদের মোহরানা আদায় করে দাও। তবে তারা যদি তার কিছু অংশ সন্তুষ্ট চিত্তে তোমাদেরকে প্রদান করে, তাহলে স্বচ্ছন্দে তোমরা তা ভোগ করতে পারো। (৪, সূরা আন্‌নিসা: ৪)

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

হে নাবী, আমি তোমার জন্য বৈধ করেছি তোমার স্ত্রীদেরকে, যাদের মাহর তুমি প্রদান করেছ এবং তাদেরকে, যাদের মালিক হয়েছে তোমার দক্ষিণ হস্ত, যা আল্লাহ তোমাকে বিনা ক্লেশে দান করেছেন। আরও বৈধ করেছি তোমার চাচার কন্যা ও ফুফুর কন্যাকে, মামার কন্যা ও খালার কন্যাকে, যারা তোমার সাথে হিজরত করেছে। আর কোন মু'মিন নারী যদি নিজেকে নবীর জন্য হেবা করে, আর নবী যদি তাকে বিয়ে করতে চায়। এটা বিশেষ করে তোমারই জন্য, অন্য মুমিনদের জন্য নয় । মুমিনদের জন্য তাদের স্ত্রী ও তাদের মালিকানাধীন দাসীদের সম্বন্ধে যা আমি নির্ধারিত করেছি, তা আমি অবগত, যাতে তা তোমার জন্য কঠিন না হয়। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (৩৩, সূরা আল্‌আহযাব : ৫০)

**৬. ঈলা**

স্ত্রীর সাথে সহবাস না করার শপথকে ঈলা বলা হয়। জাহেলী যুগে এর মাধ্যমেও স্ত্রীকে নির্যাতন করা হতো। সহবাস না করার শপথ করে স্ত্রীকে ফেলে রাখা হতো। তার সাথে সহবাসও করতো না আবার তাকে ছেড়েও দিত না। ইসলাম এর প্রতিকার করেছে। ঈলাকে চার মাসের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে, যাতে এর দ্বারা স্ত্রীকে নির্যাতন করতে না পারে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

لِلَّذِيْنَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

যারা স্বীয় স্ত্রীগণ হতে পৃথক থাকার শপথ করে, তারা চার মাস প্রতীক্ষা করবে, অতঃপর যদি তারা প্রত্যাবর্তিত হয় তাহলে নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, করুণাময়। (২, সূরা আলবাকারা : ২২৬)

ঈলার চারটি দিক রয়েছে :

১. কোনো সময় নির্ধারণ না করে স্ত্রীর সাথে সহবাস না করার শপথ করা
২. চার মাস সময়ের উল্লেখ করে স্ত্রীর সাথে সহবাস না করার শপথ করা
৩. চার মাসের বেশী সময়ের জন্য স্ত্রীর সাথে সহবাস না করার শপথ করা
৪. চার মাসের কম সময়ের জন্য স্ত্রীর সাথে সহবাস না করার শপথ করা

প্রথম তিনটি অবস্থাকে শরী'আর পরিভাষায় ঈলা বলা হয়। এগুলোর বিধান হলো, যদি চার মাসের মধ্যে কসম ভঙ্গ করে স্ত্রীর নিকট আগমন করে, তাহলে তার বিয়ে বহাল থাকবে। তবে তাকে কসম ভঙ্গ করার কারণে কাফ্‌ফারা দিতে হবে। আর চার মাস অতিবাহিত হওয়ার পরও যদি কসম ভঙ্গ না করে, তাহলে স্ত্রীর উপর নিশ্চিতভাবে

তালাক পতিত হবে। তারপর পুণরায় বিয়ে ব্যতিত স্ত্রীকে ফিরে নেওয়া জায়িয হবে না। অবশ্য স্বামী স্ত্রী সম্মত হয়ে পুণরায় বিয়ে করলে জায়িয হবে।

চতুর্থ অবস্থায় যদি কসম ভঙ্গ করে তাহলে কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে। আর কসম পূর্ণ করলেও বিয়ে অটুট থাকবে।[১০]

**৭. নারীদের ক্ষতির উদ্দশ্যে আটকে রাখা নিষিদ্ধ**

জাহেলী যুগে স্ত্রী নির্যাতনের আরেকটি কৌশল ছিল, স্ত্রীকে তালাক দিত কিন্তু 'ইদ্দত শেষ হয়ে আসলে আবার তাকে ফিরে নিত। কিন্তু ফেরত নিয়ে তার সাথে সৎভাবে সংসার করার পরিবর্তে তাকে নির্যাতন করতো। অনেক সময় তালাক দেওয়ার পর স্ত্রী যাতে অন্যত্র বিয়ে করতে না পারে সেজন্য তালাকদাতা স্বামী নানা রকম প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করতো, যাতে স্ত্রী অন্যত্র বিয়ে করতে না পারে। এভাবে তাদেরকে নির্যাতন করা হতো। ইসলাম এ ধরনের প্রথাকে নিষিদ্ধ করে দেয়, যাতে স্বামী তাকে অপছন্দ করে রাখতে না চাইলে তালাক দিয়ে বিদায় করে দেয় এবং স্ত্রী তার পছন্দমত অন্যত্র বিয়ে করতে পারে। মহান আল্লাহ এ প্রসঙ্গে বলেন,

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ

আর যখন তোমরা স্ত্রীদেরকে তালাক দাও, আর তারা তাদের 'ইদ্দতের সীমায় পৌঁছে যায়, তখন হয় তাদেরকে নিয়ম মাফিক রেখে দেবে অথবা তাদেরকে সঙ্গতভাবে বিদায় দেবে; কিন্তু তাদেরকে ক্ষতি করার জন্য অত্যাচার করার মতলবে আটকিয়ে রাখবে না। আর যে ব্যক্তি এরূপ করে, সে নিজের প্রতিই জুলুম করে। (২, সূরা আলবাকারা: ২৩১)

এ আয়াতে সে সকল উৎপীড়নমূলক আচরণের প্রতিরোধ করা হয়েছে, যা সাধারণত তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীদের সাথে করা হয়। অনেক সময় তাদেরকে অন্যত্র বিয়ে করতে বাধা দেওয়া হয়। এ ক্ষেত্রে অনেক সময় প্রথম স্বামীও বিয়ের ব্যাপারে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে মেয়ের অভিভাবকরাও দ্বিতীয় বিয়ে থেকে বিরত রাখে। আবার কেউ কেউ অর্থ-সম্পদ হাতিয়ে নেওয়ার জন্য বাধার সৃষ্টি করে। অনেক সময় তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী তার পূর্ব স্বামীর সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক পূণ:প্রতিষ্ঠার করতে চাইলে অভিভাবকগণ বা আত্মীয় স্বজনগণ তালাক দেওয়ার ফলে স্বামীর সাথে সৃষ্ট বৈরিতার কারণে উভয়ের সম্মতি থাকা সত্ত্বেও বাধার সৃষ্টি করে। অথচ স্বাধীন স্ত্রীলোককে শরী'আহ বিরোধী কাজ ব্যতীত তার মর্জি মাফিক বিয়ে থেকে বাধা দেওয়া একান্তই অন্যায়, চাই তা প্রথম স্বামীর পক্ষ থেকে হোক অথবা অভিভাবকদের পক্ষ থেকে হোক।

দীর্ঘকাল থেকে চলে আসা এ সকল নিপীড়নমূলক প্রথাকে ইসলাম নিষিদ্ধ করে নারীদেরকে এ নিস্পেষণ থেকে নিস্কৃতি দিয়েছে।"■ (চলবে)

---

১০. মুফতি মুহাম্মদ শফি, তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন (সংক্ষিপ্ত), পৃ. ১২১।

# রাসূলুল্লাহ সা. এর ক্ষমা ও উদারতা

ড. মুহাম্মদ শাহিদুল ইসলাম

**ভূমিকা**

রাসূলুল্লাহ সা. ছিলেন মানব ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ দয়া, ক্ষমাশীলতা ও উদারতার প্রতীক। তাঁর জীবনদর্শনে প্রতিশোধের পরিবর্তে ক্ষমা, কৃপণতার পরিবর্তে উদারতা এবং কঠোরতার পরিবর্তে কোমলতা ছিল প্রধান বৈশিষ্ট্য। ব্যক্তিগত জীবনে, পারিবারিক সম্পর্কে, এমনকি যুদ্ধক্ষেত্রেও তিনি এমন দয়া প্রদর্শন করেছেন যা শত্রুকেও বিস্মিত করেছে। মক্কা বিজয়ের দিনে তিনি তাঁর দীর্ঘদিনের নির্যাতনকারীদের উদ্দেশ্যে ঘোষণা করেন : 'আজ তোমাদের জন্য কোনো ভর্ৎসনা নেই, আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করুন' যা ইতিহাসে ক্ষমার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ হিসেবে স্বীকৃত। আলোচ্য প্রবন্ধে বিভিন্ন সময় রাসূলুল্লাহ সা. কর্তৃক ক্ষমা ও উদারতার অনন্য উদাহরণ সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

**১. তায়েফবাসীদের প্রতি ক্ষমা দাওয়াতের সর্বোচ্চ উদাহরণ**

তায়েফ ছিল হিজায অঞ্চলের একটি গুরুত্বপূর্ণ শহর, যেখানে বনু সাকীফ গোত্রের বাস। রাসূলুল্লাহ সা. যখন মক্কায় কাফিরদের অত্যাচারে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন এবং তাঁর আপন চাচা আবু তালিব ও প্রিয় স্ত্রী খাদিজা রা. ইন্তিকাল করেন, তখন তিনি এক নতুন আশ্রয় ও দাওয়াহর ক্ষেত্রের সন্ধানে তায়েফে যান। উদ্দেশ্য ছিল তাদের ইসলাম গ্রহণে আহ্বান করা, এবং যদি তারা সহযোগী হয়, তাহলে মক্কায় কুরাইশের অবরোধ ভেঙে একটি বিকল্প কেন্দ্র গড়ে তোলা।

কিন্তু তায়েফবাসী অত্যন্ত অবমাননাকরভাবে রাসূল সা. কে প্রত্যাখ্যান করে। তাঁরা তাঁকে পাথর ছুঁড়ে আহত করে। তাঁর পা রক্তাক্ত হয়ে যায়। এমনকি জিবরাইল আঃ প্রস্তাব দেন যে, দুই পাহাড় মিলিয়ে তাদের ধ্বংস করে দেওয়া যায় কিনা। এই পর্যায়ে রাসূলুল্লাহ সা. দু'আ করেন, যা শুধু ক্ষমা নয়, বরং করুণার শীর্ষ নিদর্শন। রাসূলুল্লাহ সা. তায়েফবাসীদের জন্য দু'আ করে বলেন :

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

"হে আল্লাহ! আমার জাতিকে ক্ষমা করে দিন, কেননা তারা জানে না।"[১]

তায়েফের এই ঘটনা পরবর্তীতে যে কতভাবে দাওয়াহ সফলতার রূপ নেয়, ইতিহাস তা বলে। রাসূলুল্লাহ সা. আশায় ছিলেন, তাদের পরবর্তী প্রজন্ম হিদায়াত পাবে এবং হয়েছেও তাই। পরবর্তীতে তায়েফের বহু মানুষ ইসলাম গ্রহণ করে। আর এইজন্য মহান আল্লাহ রাসূলুল্লাহ সা.কে উদ্দেশ্য করে বলেছেন :

---

১. বুখারী, আস-সহীহ, হাদীস নং-৪৩৯৭।

فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ

"তুমি ক্ষমা করো, সুন্দরভাবে ক্ষমা করো।"[২]

তাই তায়েফের এই ঘটনাটি কেবল রাসূলুল্লাহ সা. এর হৃদয়ের বিশালতাই প্রকাশ করে না, বরং দাওয়াহর এক অতুলনীয় কৌশল শিক্ষা দেয়, আর তা হলো হৃদয় জয় করতে হয়, শহর নয়। তাঁর এই ক্ষমাশীলতা ছিল পাথর থেকে ফুল ফোটানোর মতো এক অলৌকিক সৌন্দর্য।

**২. মক্কা বিজয়ের দিন ক্ষমার শ্রেষ্ঠ ইতিহাস**

মক্কা বিজয় হল ইসলামের ইতিহাসে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়গুলোর একটি। দীর্ঘ ২১ বছরের নির্যাতন, বহিষ্কার, হত্যা ও অবমাননার পর রাসূলুল্লাহ সা. ১০,০০০ সাহাবিকে নিয়ে মক্কা বিজয়ের জন্য অগ্রসর হন। এটা ছিল এমন এক মুহূর্ত, যেখানে প্রতিশোধ নেয়ার অত্যন্ত সহজ সুযোগ ছিল। কিন্তু রাসূল সা. জিহাদের ময়দানকে বদলে দিলেন দাওয়াহর ময়দানে। বিজয়ের মধ্যেও তিনি নম্র, ক্ষমাশীল, বিনয়ী। মক্কার মানুষরা ভয়ে কাবায় জড়ো হয়েছিল। তাঁদের চোখে ভয়, অন্তরে শঙ্কা। তখন রাসূলুল্লাহ সা. যা বলেছিলেন, তা ঐতিহাসিকগণ বর্ণনা করেছেন এভাবে :

قَالَ مَا تَظُنُّونَ أَنِّي فَاعِلٌ بِكُمْ؟

"তোমরা কী মনে করো, আমি তোমাদের সাথে কী করবো?"

মক্কাবাসীরা বলল,

أَخٌ كَرِيمٌ وَابْنُ أَخٍ كَرِيمٍ

"আপনি সম্মানিত ভাই, সম্মানিত ভাইয়ের সন্তান।"

রাসূল সা. বললেন,

اذْهَبُوا فَأَنْتُمُ الطُّلَقَاءُ

"তোমরা যাও, তোমরা সবাই মুক্ত।"[৩]

মক্কা বিজয়ের দিন রাসূল সা. আল্লাহর নির্দেশিত 'রহমত' হয়ে সকলের ওপর বর্ষিত হলেন। অথচ এই মক্কাবাসীরাই রাসূল সা. কে হত্যার ষড়যন্ত্র করেছিল; সাহাবীদের নির্যাতন করেছিল; বয়কট করেছিল এবং রাসূল সা. কে তায়েফে যেতে বাধ্য করেছিল; আর তার সাথে যুদ্ধ করেছে বদর, উহুদ, খন্দকে। তবুও, তিনি প্রতিশোধ না নিয়ে ক্ষমা করেন।

**৩. হিন্দা ও ওয়াহশি রা. এর প্রতিও ক্ষমার অসীম দৃষ্টান্ত**

উহুদের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সা. এর প্রিয় চাচা ও ইসলামি বাহিনীর বীর সেনানী হামজা ইবন আব্দুল মুত্তালিব রা. শাহাদাত বরণ করেন। তাঁকে শহীদ করেন আফ্রিকান দাস ওয়াহশি ইবন হরব, যার উপর হিন্দা বিনতে উতবা শর্ত দিয়েছিলেন যদি হামজাকে

---

২. সূরা আল-হিজর, ৮৫।

৩. ইবনে হিশাম, আস-সীরাত, খ. ৪, পৃ. ৩৩৬।

হত্যা করো, তবে তোমার মুক্তি। হামজা রা. এর শহীদ হওয়ার পর হিন্দা তাঁর কলিজা বের করে চিবান। সে মুহূর্ত ছিল রাসূল সা. এর জীবনের সবচেয়ে বেদনাদায়ক অধ্যায়গুলোর একটি। হামজা রা. এর শাহাদাতের সময় রাসূল সা. কেঁদে উঠলেন, তাঁর চোখ থেকে অশ্রু ঝরল। তবুও, তিনি প্রতিশোধ নিলেন না। পরে ওয়াহশি ইসলাম গ্রহণ করে মদিনায় এলে, রাসূল সা. তাকে ক্ষমা করে দেন। এ সম্পর্কে ওয়াহশি রা. নিজেই বর্ণনা করেন:

فَلَمَّا قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ بِالْمَدِينَةِ، قِيلَ لَهُ: هَذَا وَحْشِيٌّ، فَقِيلَ لَهُ: أَأَنْتَ وَحْشِيٌّ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: أَنتَ قَتَلْتَ حَمْزَةَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُغَيِّبَ وَجْهَكَ عَنِّي؟

"আমি যখন মদিনায় এলাম, আমাকে রাসূল সা. এর সামনে উপস্থিত করা হল। তিনি বললেন, 'তুমি কি ওয়াহশি?' আমি বললাম, 'হ্যাঁ।' তিনি বললেন, 'তুমি কি হামজাকে হত্যা করেছিলে?' আমি বললাম: 'হ্যাঁ।' তখন তিনি বললেন, 'তুমি কি আমার দৃষ্টির আড়ালে থাকতে সমর্থ হবে?"[৪]

রাসূল সা. তাঁকে ক্ষমা করে দিলেন, কারণ তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছেন। এটাই ছিল ইসলামের নীতি; কারণ ইসলাম পূর্ব সকল পাপ ধুয়ে ফেলে। কিন্তু ব্যক্তিগত কষ্ট ও স্মৃতি থাকায় তিনি ওয়াহশিকে নিজের সামনে দেখতে চাইলেন না এটা মানবিক। ক্ষমা মানে কষ্ট মুছে ফেলা নয়, বরং প্রতিশোধ না নেওয়া। হিন্দাও পরবর্তী সময়ে মুসলিম হন, রাসূল সা. তাঁকেও প্রতিহিংসা না করে সাদরে গ্রহণ করেন। এদিকে ইঙ্গিত করে মহান আল্লাহ ঘোষণা করেন :

قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ

"কাফিরদেরকে বলুন, যদি তারা (কুফরী থেকে) বিরত হয়, তবে তাদের পূর্বের (অপরাধসমূহ) ক্ষমা করে দেওয়া হবে।"[৫]

এ থেকে স্পষ্ট যে, রাসূল সা. ওয়াহশির উপর রাগ দেখাননি, দন্ড দেননি, বরং তাঁর ঈমান ও ক্ষমার জন্য দু'আ করেন। তিনি তাকে ইসলামের রণাঙ্গনে কাজে লাগান। ওয়াহশিই পরে ইয়ামামার যুদ্ধে মুসাইলামা আল কজ্জাব (মিথ্যা নবী) কে হত্যা করেন।

ওয়াহশি ও হিন্দা দুই জনই এমন অপরাধ করেছিলেন, যা সাধারণ মানুষ কখনো ভুলতে পারে না। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সা. ছিলেন ক্ষমার সাগর। তিনি দেখিয়ে দিলেন, একটি সমাজ তখনই পরিবর্তিত হয়, যখন দাওয়াত ও ক্ষমা একসাথে হয়।

**৪. ইহুদি মহিলার বিষ দেওয়া খাবার খাওয়ার পরও রাসূল সা. এর ক্ষমা**

রাসূলুল্লাহ সা. এর জীবনের অন্যতম বিস্ময়কর ও হৃদয়স্পর্শী ঘটনা এটি, যা তাঁর ক্ষমাশীলতার এক অনন্য নিদর্শন। খায়বার যুদ্ধের পর, এক ইহুদি নারী (যার নাম জয়নাব ছিল) রাসূল সা. কে হত্যা করার উদ্দেশ্যে বিষ মেশানো একটি ভেড়ার মাংস

৪. আত-তাবরানী, আল-মুয়াজ্জাম আল-কবীর, হাদীস নং-১১৬৭৮।
৫. সূরা আল-আনফাল, ৩৮।

(বিশেষ করে কাঁধের অংশ, যেটি রাসূল সা. পছন্দ করতেন) পরিবেশন করে। তিনি প্রথম টুকরা মুখে দেওয়ার পরই বিষের অস্তিত্ব টের পান এবং থেমে যান। এক সাহাবী, বাশার ইবনু বারা রা., যিনি তা খেয়েছিলেন, তিনি সাথে সাথেই বিষক্রিয়ায় মারা যান। এমন ভয়ঙ্কর হত্যাচেষ্টা সত্ত্বেও রাসূল সা. সেই ইহুদি মহিলাকে ক্ষমা করে দেন। এটি ছিল তাঁর উদারতা ও অহিংস নীতির এক পরাকাষ্ঠা। এ প্রসঙ্গে হাদীসের এক বর্ণনায় এসেছে, আনাস রা. বলেন,

**أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهُودِيَّةٌ، فَدَعَتْهُ إِلَى خُبْزٍ وَشَاةٍ مَسْمُومَةٍ، فَأَكَلَ، فَجِيءَ بِهَا، فَقِيلَ: أَلَا نَقْتُلُهَا؟ قَالَ: لَا.**

"এক ইহুদি নারী রাসূলুল্লাহ সা. কে দাওয়াত দেয় রুটি ও বিষমিশ্রিত ভেড়ার মাংস খাওয়ানোর জন্য। তিনি তা খান। পরে তাকে (ইহুদি নারীকে) হাজির করা হলে, লোকেরা বলল, "আমরা কি তাকে হত্যা করব না?" রাসূল সা. বললেন, "না।"[৬]
রাসূল সা. কে প্রশ্ন ও তাঁর জবাব,

**قَالَ لَهَا: مَا حَمَلَكِ عَلَى مَا صَنَعْتِ؟ قَالَتْ: أَرَدْتُ أَنْ أَقْتُلَكَ. فَقَالَ: مَا كَانَ اللهُ لِيُسَلِّطَكِ عَلَيَّ.**

"রাসূল সা. তাকে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কেন এমন করলে?" সে বলল, "আমি আপনাকে হত্যা করতে চেয়েছিলাম।" তিনি বললেন, "আল্লাহ কখনোই তোমাকে আমার উপর কর্তৃত্ব দিবেন না।"[৭]
এ থেকে স্পষ্ট যে, যেখানে একজন রাষ্ট্রনায়কের প্রাণনাশের চেষ্টা হয়, সেখানে চরম প্রতিশোধ হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু রাসূল সা. তাঁর ব্যক্তিগত ক্ষোভে প্রতিক্রিয়া দেখাননি। এছাড়া তিনি জানতেন, এই আচরণ ইসলামের মহানুভবতা প্রকাশ করবে এবং শত্রুর হৃদয়ে ইসলামের প্রতি সম্ভ্রম জাগাবে।

**৫. কা'ব ইবনু জুহাইরকে তাঁর কবিতার বিনিময়ে ক্ষমা করে দেওয়া**

কা'ব ইবনু জুহাইর রা. ছিলেন বিখ্যাত আরবি কবি এবং প্রখ্যাত কবি বনু সুআয়িদা গোত্রের অন্তর্গত। তাঁর পিতা জুহাইর ইবনু আবি সুলমা ছিলেন মু'আল্লাকাত কবিদের একজন, যাঁর কবিতা কাবার গায়ে টানানো হয়েছিল। কা'ব প্রথমদিকে ইসলাম গ্রহণ করেননি; বরং তিনি মুসলিমদের ও রাসূলুল্লাহ সা. কে ব্যঙ্গ করে কবিতা লিখতেন, বিশেষ করে তাঁর বিখ্যাত কবিতা "**بانت سعاد**" এর আগে কিছু কবিতা ইসলাম বিদ্বেষমূলক ছিল। তার ভাই বুজাইর ইসলাম গ্রহণ করার পর কা'ব তার ওপর খুবই ক্ষিপ্ত হন এবং প্রকাশ্যে মুসলিমদের অপমান করেন। ফলে রাসূলুল্লাহ সা. তাঁর বিরুদ্ধে মৃত্যুদন্ডের হুকুম দেন। এরপর কা'ব বুঝতে পারলেন, তিনি ভুল করেছেন এবং তাঁর প্রতি দয়ামায়া চাইতে হলে সরাসরি রাসূল সা. এর কাছে যেতে হবে। তাই তিনি গোপনে মদীনায় আসেন এবং একদিন রাসূলুল্লাহ সা. এর সাহাবীদের মাঝে ঢুকে

৬. বুখারী, আস-সহীহ, হাদীস নং-২৬১৭।
৭. আবূ দাউদ, আস-সুনান, ৫৪১২।

পড়ে, মুখ ঢেকে রাখেন এবং তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে এই ঐতিহাসিক কবিতা " **بانت سعاد**" (বানাত সু'আদ) পাঠ করেন।[৮]

এই কবিতার শেষে সাহাবীরা কেউ কেউ তাঁর বিরুদ্ধে ক্ষেপে যান এবং বলেন, "এ তো সেই কা'ব, যাকে হত্যা করতে বলা হয়েছে।" তখন রাসূলুল্লাহ সা. বলেন,

**دَعُوهُ، فَقَدْ جَاءَ تَائِبًا**

"তাকে ছেড়ে দাও, সে তো তাওবা করে এসেছে।"

এরপর তিনি কা'বকে ক্ষমা করে দেন এবং উত্তমভাবে গ্রহণ করেন। এমনকি, তাঁর কবিতা এতটা রাসূল সা. এর হৃদয়ে স্থান করে নেয় যে, তিনি তাঁর গায়ে পরা রিদা (চাদর) খুলে তাঁকে উপহার দেন। এ চাদর পরবর্তীতে (খিরকাতুল বুরদা) নামে পরিচিত হয় এবং এটি পরবর্তী মুসলিম শাসকদের অন্যতম অমূল্য স্মৃতিচিহ্নে পরিণত হয়।

**৬. আবু সুফিয়ানের পরিবারের ইসলাম গ্রহণে দয়াময় ভূমিকা**

আবু সুফিয়ান ইবন হারব ছিলেন মক্কার অন্যতম প্রভাবশালী নেতা এবং দীর্ঘদিন ইসলাম ও নবী সা.এর বিরুদ্ধচারণকারী। তিনি ও তাঁর পরিবার (বিশেষ করে স্ত্রী হিন্দা) ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে বহু যুদ্ধের নেতৃত্ব দিয়েছেন। যেমন- উহুদ, খন্দক ও হুনাইন। কিন্তু ফতহে মক্কার সময় এবং পরে রাসূলুল্লাহ সা. এর দয়া ও ক্ষমার এমন এক মহান দৃষ্টান্ত আমরা দেখি, যা শত্রুকেও আপন বানিয়ে তোলে। এদিকে ইঙ্গিত করে মহান আল্লাহ ঘোষণা করেছেন,

**ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ**

"তুমি মন্দের প্রতিরোধ করো উত্তম পন্থায়। তাহলে দেখবে, যার সাথে তোমার শত্রুতা ছিল, সে তোমার অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়ে গেছে।"[৯]

মক্কা বিজয়ের সময়, যখন নবী সা. দশ হাজার সাহাবী নিয়ে মক্কা প্রবেশ করেন, আবু সুফিয়ান তখনও নিশ্চিত ছিলেন যে, তাঁকে ও তাঁর পরিবারকে হত্যা করা হবে। কিন্তু রাসূল সা. বললেন,

**من دخل دار أبي سفيان فهو آمن**

"যে ব্যক্তি আবু সুফিয়ানের ঘরে প্রবেশ করবে, সে নিরাপদ।"[১০]

এই ঘোষণা ছিল এক অপূর্ব দয়া ও রাজনৈতিক প্রজ্ঞার নিদর্শন। এটি আবু সুফিয়ানের সম্মান রক্ষা করে তাঁকে এবং তাঁর পরিবারকে ইসলাম গ্রহণের পথে অনুপ্রাণিত করে।

হিন্দা (আবু সুফিয়ানের স্ত্রী) ছিলেন হামযা রা. এর হত্যাকারী ওয়াহশিকে হত্যা কাজে নিয়োগদানকারী। ফতহে মক্কার সময় তিনি ভয়ে ও গোপনে ইসলাম গ্রহণ করতে মুখ ঢেকে নবী সা. এর কাছে গিয়ে বলেন, "আমি হিন্দা, আবু সুফিয়ানের স্ত্রী। আপনি কি আমাকে ক্ষমা করবেন?" রাসূল সা. বললেন, **مرحبًا بكِ** "তোমাকে স্বাগতম"। তিনি

---

৮. আল-বাগদাদী, খিজানাতুল আদাব, খ. ২, পৃ. ৩৯৪।

৯. সূরা ফুসসিলাত, ৩৪।

১০. ইবন হিশাম, আস-সীরাত, খ. ৪, পৃ. ৮৪।

তাকে গ্রহণ করলেন, তাকে তিরস্কার করলেন না, অপমান করলেন না। এক সময়ের তীব্র শত্রুকেও তিনি ভালোবাসা ও ক্ষমায় আপন করে নিলেন।

রাসূলুল্লাহ সা. এর এই দয়াদ্রতা ও ক্ষমার নিদর্শন ইসলামের উদারতা ও দাওয়াহর গভীর শিক্ষার প্রতিফলন। একজন ব্যক্তি, যিনি তাঁর প্রিয় চাচাকে (হামযা রা. কে) হারিয়েছেন হিন্দার হাতে; সেই ব্যক্তিও যেন তাকে ভালোবাসা ও সম্মান দিয়ে দাওয়াত দেন এটা কেবল রহমাতুল্লিল আলামীন এর পক্ষেই সম্ভব।

### ৭. যুদ্ধ-বন্দীদের সাথে রাসূল সা. এর উদার ব্যবহার

বদর যুদ্ধে মুসলমানরা ৭০ জন কাফিরকে বন্দী করে। তখন মুসলমানদের সামর্থ্যও সীমিত ছিল। তবুও রাসূল সা. বন্দীদের হত্যা না করে তাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করেন। এ সম্পর্কে হাদীসের এক বর্ণনায় এসেছে, তিনি সাহাবীগণকে নির্দেশ দিয়েছিলেন,

**استوصوا بالأسرى خيرًا**

"তোমরা যুদ্ধবন্দীদের সাথে সদয় আচরণ করো।"

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ইবন হিশাম লিখেছেন, মদিনার সাহাবারা নিজেদের খাবার তুলে দিয়ে বন্দীদেরকে অগ্রাধিকার দিতেন। এ প্রসঙ্গে আল-কুরআনেও এসেছে,

**وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا**

"তারা খাদ্য দান করে আল্লাহর ভালবাসায় মিসকিন, ইয়াতিম এবং বন্দীকে।"[১১]

মুফাসসিরগণ বলেন, এখানে 'أَسِيرًا' মানে কাফির বন্দী। এটা বোঝায়, রাসূল সা. এর শিক্ষা এমন ছিল যে, কাফির বন্দীকেও সম্মান ও দয়ার সাথে দেখতে হয়।

হুনাইন ও তায়েফ যুদ্ধের পরে হাওয়াযিন গোত্রের বহু বন্দী মুসলিম বাহিনীর হাতে আসে। তখন তিনি তাঁদের প্রতি দয়া করে বন্দীদের মুক্ত করে দেন, সন্তানদের তাদের মায়ের কাছে ফিরিয়ে দেন। তারা ইসলাম গ্রহণ করে বলে,

**ما رأينا أبرّ من محمد**

"আমরা মুহাম্মাদ সা. এর মতো উদার আর কাউকে দেখিনি।"

অনেক যুদ্ধবন্দী, তারা ছিল ইসলামের কঠিন শত্রু, রাসূল সা. এর দয়ার কারণে ইসলাম গ্রহণ করে। দয়ার মাধ্যমে ইসলাম এমন এক দাওয়াহর শক্তি সৃষ্টি করে, যা শুধু তলোয়ার দিয়ে নয় বরং হৃদয় জয় করেই বিজয় করে।

রাসূলুল্লাহ সা. বন্দীদের সাথে এমন দয়ার আচরণ করতেন যেন তারা অপরাধী নয়, বরং পথহারা মানুষ, যাদের সত্যের আলোয় আনা প্রয়োজন। তাঁর এই সদয়, ন্যায়পরায়ণ ও মানবিক আচরণই ইসলামকে একটি সভ্য ও নৈতিকতার দ্বীনে পরিণত করেছে।

### ৮. তীব্র শত্রু ইকরিমাহ রা. এর ইসলাম গ্রহণে রাসূল সা. এর দয়ালু ভূমিকা

ইকরিমাহ ছিলেন কুরাইশদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি এবং ইসলামের অন্যতম কঠিন শত্রু

---

১১. সূরা আদ-দাহর, ৮।

আবু জাহল এর পুত্র। তাঁর পিতা ইসলামের প্রচন্ড বিরোধী ছিলেন, এবং ইকরিমাহও প্রথমদিকে পিতার পথ অনুসরণ করে মুশরিকদের পক্ষে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন বদর, উহুদ ও খন্দক যুদ্ধের একজন প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী। রাসূল সা. এর প্রতি তাঁর ব্যক্তিগত শত্রুতাও ছিল অত্যন্ত তীব্র। মক্কা বিজয়ের দিন যখন রাসূল সা. ঘোষণা দেন যে, অনেক কাফিরকে ক্ষমা করা হবে, তখন কিছু ব্যতিক্রম ছিল যাঁদের নাম "অমার্জনীয়দের" তালিকায় ছিল। তাদের মধ্যে ছিলেন ইকরিমাহ ইবন আবূ জাহিল। ফাতহে মক্কার পর নবীজি সা. ঘোষণা করেন,

**من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن**

"যে ব্যক্তি আবু সুফিয়ানের ঘরে প্রবেশ করবে সে নিরাপদ, যে ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করবে সে নিরাপদ, যে নিজ গৃহে নিজেকে আবদ্ধ করবে সেও নিরাপদ।"[১২]

এই ঘোষণার মধ্যেও কিছু কাফির ছিলেন, যাঁদের অপরাধ এত গুরুতর ছিল যে, তাঁদের 'তালিকাভুক্ত' অপরাধী হিসেবে ঘোষিত করা হয়, যাদের জন্য 'সাধারণ ক্ষমা' প্রযোজ্য ছিল না। ইকরিমাহ ছিলেন সেই তালিকার অন্যতম নাম।

ইকরিমাহ যখন জানতে পারেন যে তিনি সাধারণ ক্ষমার অন্তর্ভুক্ত নন, তিনি পালিয়ে ইয়ামান অঞ্চলের দিকে চলে যান। তাঁর স্ত্রী উম্মে হাকিম বিনতে হারিস (যিনি তখন ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন), রাসূল সা. এর কাছে এসে তাঁর স্বামীর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন। রাসূল সা. বলেন, **هو آمن، فليعد**

"সে নিরাপদ, সে যেন ফিরে আসে।"[১৩]

রাসূলুল্লাহ সা. এর এই একটি বাক্যে ছিল বিশাল এক দয়ার ইতিহাস! এরপর উম্মে হাকিম ইকরিমাহর পিছু যান এবং দয়ার বার্তা পৌঁছে দেন। ইকরিমাহ প্রথমে বিশ্বাসই করতে পারছিলেন না যে, তিনি যাঁর বিরুদ্ধে এত যুদ্ধ করেছেন, সেই রাসূল সা. তাঁকে ক্ষমা করে দিতে পারেন! কিন্তু রাসূল সা. এর দয়া ও উদারতা তাঁকে চরমভাবে প্রভাবিত করে।

ইকরিমাহ ফিরে এসে নবীজি সা. এর সামনে দাঁড়ালেন। রাসূল সা. তাঁকে স্বাগত জানালেন। তখন ইকরিমা রা. বলেন,

**يا مُحَمَّد، إن كنت قد عفوت عني فاشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله**

"হে মুহাম্মদ! যদি আপনি আমাকে সত্যিই ক্ষমা করে থাকেন, তবে সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই এবং আপনি আল্লাহর রাসূল।"

ইকরিমাহ ছিলেন যুদ্ধের ময়দানে তলোয়ার চালানো এক শত্রু। কিন্তু রাসূল সা. এর করুণাময় দাওয়াহ, উদার ক্ষমা ও বিনয়ী ব্যবহার তাঁর হৃদয় জয় করে নিলো। এভাবেই ইসলাম তলোয়ার নয়, উদারতা দিয়ে জয় করে চলেছিল দুনিয়াবাসীর হৃদয়।

---

১২. ইবন হিশাম, আস-সীরাহ, খ. ২, পৃ. ৪০২।
১৩. ইবন হিশাম, আস-সীরাত, খ. ২, পৃ. ৪০৫।

**৯. উহুদের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সা. এর দন্তভঙ্গকারী হাব্বার ইবনুল আসওয়াদকে ক্ষমা**

হাব্বার ইবনুল আসওয়াদ ছিলেন মক্কার এক উগ্র মুশরিক ও ইসলামের প্রবল বিরোধী। তিনি একাধিকবার মুসলমানদের উপর জুলুম-নির্যাতন চালান এবং ব্যক্তিগতভাবে রাসূল সা. ও তাঁর পরিবারকে কষ্ট দিয়েছেন। তাঁর সবচেয়ে নৃশংস কাজগুলোর একটি হলো: তিনি নবীজি সা. এর কন্যা উম্মে কুলসুম রা., যিনি হিজরতের সময় মক্কা থেকে মদীনায় যাচ্ছিলেন, তাঁকে উট থেকে বর্শা দিয়ে আঘাত করে ফেলে দেন। এতে উম্মে কুলসুম গুরুতর আহত হন এবং গর্ভপাত ঘটে। এটি ছিল ইসলামের ইতিহাসে এক ভয়ানক অপরাধ যা সরাসরি নবীজির কন্যার উপর আক্রমণ।

স্বাভাবিকভাবেই, কোনো মানুষ হলে এর চরম প্রতিশোধ নেওয়া হতো। কিন্তু রাসূল সা. হলেন সকল জাতির প্রতি দয়ার উৎস। মক্কা বিজয়ের সময় হাব্বার ছিলেন 'মাফযোগ্য নয়' এমন লোকদের একজন তালিকাভুক্ত অপরাধী। কিন্তু তাও তিনি একপর্যায়ে নিজে ইসলাম গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। হাব্বার ইবনুল আসওয়াদ যখন ইসলামে প্রবেশের আগ্রহ দেখান, অনেকে নবীজি সা. কে বোঝাতে চেষ্টা করেন তাঁর অপরাধের ভয়াবহতা সম্পর্কে। তবুও নবীজি সা. বলেন,

قد عفوت عنه، والإسلام يجبّ ما قبله

"আমি তাকে ক্ষমা করে দিলাম। ইসলাম পূর্বের সব অপরাধ ধুয়ে দেয়।"[১৪]

এটা শুধু 'ক্ষমা' নয়, এটা ছিল এক মহান আত্মাকে দান করা যে এমন একজনকে ক্ষমা করলেন, যিনি তাঁর কন্যাকে আহত করে গর্ভপাত ঘটিয়েছেন!

হাব্বার রা. বলেন, "হে আল্লাহর রাসূল! আমার অপরাধ মারাত্মক, কিন্তু আমি সত্যিকার ইসলাম গ্রহণে ইচ্ছুক। আপনার দয়া ছাড়া আমার মুক্তি নেই।" তখন রাসূল সা. তাঁকে গ্রহণ করলেন, সম্মান দিলেন, ইসলামের শিক্ষা দিলেন। হাব্বার রা. পরবর্তীতে একজন একনিষ্ঠ মুসলমান হয়ে যান, এবং ইসলামের জন্য কাজ করেন।

হাব্বার রা. এর গল্প হলো রাসূল সা. এর দয়ার এক মহাকাব্য। যেখানে একজন ব্যক্তির পারিবারিক ক্ষতি ও যন্ত্রণার মধ্যেও নবীজি সা. প্রতিশোধ নেননি, বরং তাকে ইসলাম গ্রহণের সুযোগ দিয়েছেন যেন সে জাহান্নামের বদলে জান্নাতের পথে আসতে পারে। এটাই হলো রাসূল সা. এর দাওয়াহর সৌন্দর্য।

**১০. মুনাফিক প্রধান আবদুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের প্রতি দয়া ও সহানুভূতি**

আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালূল ছিল মদীনায় বসবাসকারী এক চতুর প্রকৃতির রাজনীতিবিদ । হিজরতের পূর্বে মদিনার লোকেরা তাকে রাজা বানাতে চেয়েছিল। কিন্তু রাসূল সা. এর আগমন তার সে পরিকল্পনা বানচাল করে দেয়। এ কারণে সে ছিল সবচেয়ে ভয়ংকর মুনাফিক তথা মুখে ইসলাম, অন্তরে কুফর।

উহুদের যুদ্ধে সেনাবাহিনীর এক-তৃতীয়াংশকে নিয়ে সে ফিরে গিয়েছিল। উম্মুল মু'মিনীন

১৪. ইবন হিশাম, আস-সীরাহ, খ. ৪, পৃ. ৫৮।

আয়েশা রা. কে নিয়ে চরম অপবাদ দিয়েছিল। আবদুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের মৃত্যুর পরে তার ছেলে (আবদুল্লাহ) একজন প্রকৃত মুসলিম রাসূল সা. এর কাছে এসে আবেদন জানালেন, "ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি যদি আমার পিতার জন্য নিজের জামা দেন যাতে তাকে দাফন করা হয়, তাহলে আমি কৃতজ্ঞ থাকব।" বুখারী, আস সহীহ, হাদীস নং-১৩৬৪। তাঁর অনুরোধে রাসূল সা. নিজের জামা খুলে দিলেন। এমনকি তার জানাযাও পড়তে চাইলেন! রাসূল সা. যখন তার জানাযা নামায পড়তে দাঁড়ালেন, তখন উমর রা. বললেন,"ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি কি এই মুনাফিকের জানাযা পড়তে যাচ্ছেন, যিনি এমন কথা বলেছিল এবং এমন কাজ করেছিল?" রাসূল সা. বললেন,

إِنِّي خُيِّرْتُ فَاخْتَرْتُ

"আমি (আল্লাহর পক্ষ থেকে তার জন্য ক্ষমা চাওয়া না চাওয়ার) এখতিয়ার পেয়েছি, তাই আমি তারজন্য ক্ষমা চাওয়াকেই গ্রহণ করছি।"[১৫]

পরে আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহি নাযিল হলো:

وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰٓ أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِۦٓ ۖ إِنَّهُمْ كَفَرُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ...

"তুমি কখনো তাদের কোনো মৃত ব্যক্তির জানাযা পড়বে না, এবং তার কবরের পার্শে দাঁড়াবেও না। তারা তো আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অস্বীকার করেছিল।"[১৬]

এরপর রাসূল সা. আর কোনো মুনাফিকের জানাযা পড়েননি। এই ঘটনাই রাসূল সা. এর উদারতার এক উজ্জ্বল প্রমাণ। কারণ, তিনি এমন একজনকে দাফনের জন্য নিজের ব্যক্তিগত জামা দিলেন, যে তাঁকে পদে পদে অপমান করেছে। তিনি জানাজা পড়তে দাঁড়ালেন এমন মুনাফিকের জন্য, যেন তার পরকালীন মুক্তির আশা করা যায়। এটাই নববী দাওয়াহর আসল রূপ। একজন শত্রুর ক্ষেত্রেও সুসম্পর্ক, ক্ষমা ও হৃদ্যতার সর্বোচ্চ সীমা অবধি পৌঁছানো।

পরিশেষে বলা যায় যে, রাসূলুল্লাহ সা. এর ক্ষমা ও উদারতা শুধু ব্যক্তিগত গুণাবলি নয়, বরং সমগ্র ইসলামী নৈতিকতার ভিত্তি। তিনি প্রমাণ করেছেন যে, মানুষের হৃদয় জয় করার সর্বোত্তম উপায় হলো দয়া ও ক্ষমার মাধ্যমে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা। তাঁর উদারতা শুধু সম্পদ দানে সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং সময়, জ্ঞান, ও মনোযোগ দানে সমানভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। তিনি এমন এক আদর্শ স্থাপন করেছেন যেখানে শক্তি ও সাহসের সাথে করুণা ও ক্ষমাশীলতা সমন্বিত হয়েছে। তাই আজকের বিভক্ত ও সহিংসতাপূর্ণ বিশ্বে তাঁর আদর্শ অনুসরণই হতে পারে স্থায়ী শান্তি ও মানবিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার সঠিক দিশা। ■

**লেখক :** সহযোগী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, হামদর্দ বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ, মুন্সিগঞ্জ।

১৫. বুখারী, আস-সহীহ, হাদীস নং-১৩৬৪।

১৬. সূরা আত-তাওবা, ৮৪।

# সীরাতুন্নবী মাস উপলক্ষ্যে মূল্য ছাড়!

## ৩২টি বই ১০,৬৮০ টাকা, কমিশন বাদে ৫০০০ টাকা

১. সীরাতে ইবনে হিশাম ২. আর রাহিকুল মাখতুম ৩. রাসূলুল্লাহ (সা.) বিপ্লবী জীবন ৪. সাহাবীদের বিপ্লবী জীবন (১-২) ৫. রিয়াদুস সালেহীন (১-৪) ৬. আসান ফিকাহ (১-২) ৭. ফিকাহে মুহাম্মদী (১-৩) ৮. পয়গামে মুহাম্মদী ৯. মাতা-পিতা ও সন্তানের অধিকার ১০. এন্তেখাবে হাদীস (১-২) ১১. রাহে আমল (১-২) ১২. কবীরা গুনাহ ১৩. গীবত বা পরনিন্দা ১৪. মহিলা সাহাবী ১৫. ইসলামের সামাজিক বিধান ১৬. বাইবেল কোরআন বিজ্ঞান ১৭. বোখারা সমরকন্দের করণ ইতিহাস ১৮. আদাবে যিন্দেগী ১৯. ওমর ইবনে আব্দুল আজীজ ২০. আধুনিক যুগ ইসলাম কৌশল ও কর্মসূচী ২১. ইসলামের পূর্ণ জাগরণে ইখওয়ানের ভূমিকা ২২. পর্দা কি, কেন পর্দা করনা? ২৩. কিতাবুল ফিতান ২৪. রাসূলুল্লাহর সৈনিক জীবন। ২৫. ইসলামে সামাজিক ন্যায়-নীতি ২৬. ৭১-এ কি ঘটেছিল রাজাকার কারাছিল।

## বিশেষ আকর্ষণ ৩৫টি বই ২০৮৫ কমিশন বাদে ১০০০

১. আখিরাতের প্রস্তুতি ২. ভোট দিবো কাকে এবং কেন? ৩. শহীদে কারবালা ৪.মহররমের শিক্ষা? ৫. কবরের সওয়াল জওয়াব ৬. আমরা দাওয়াতী কাজ কীভাবে করবো? ৭. জান্নাত লাভের উপায় ৮. কোরআন হাদীস সংকলন ৯. নাজাতের সঠিক পথ ১০. আল্লাহর পথে ব্যয় ১১. বোরকা ওড়না সাজ-সজ্জা ১২. লজ্জা-শরমের কথা ১৩. তাওবার দরজা খোলা ১৪. লোকমান (আ) ১০টি উপদেশ ১৫. মানুষের জিজ্ঞাসা আল্লাহর জবাব ১৬. ইসলামী আন্দোলনে কর্মীদের সামাজিক কাজ। ১৭. কুরআনের ১৪ সূরার মর্মকথা ১৮. নারী নৈতৃত্ব ১৯. হতাশ হবেন না সফলতার ৫০০ উপায় ২০. চক্ষু শীতলকারী পরিবার গড়ার ১০০ উপায় ২১. মানুষের প্রয়োজন ১৩টি গুণ অর্জন ১৩ দোষ বর্জন ২২. ভালো মানুষ ভালো নেতা ২৩. মুসলিম উম্মাহ ৭৩ ফিরকা ২৪. সালাত ত্যাগকারীর ভয়াবহ শাস্তি ২৫. ঈমানের ৭০ শাখা ২৬. কুরআনী জ্ঞান লাভের গুরুত্ব। ২৭. কালেমার হাকীকত। ২৮. মায়ের দুধের পুষ্টিগুণ। ২৯. ইসলামী দন্ডবিধি ৩০. ইসলামে রাজদন্ড ৩১. প্রচলিত জাল হাদিস। ৩২. মিয়ারে হক ৩৩. ইমাম নববীর; চল্লিশ হাদীস। ৩৪. ইনফাক ফি-সাবিলিল্লাহ। ৩৫. প্রচলিত শিরক।

## আসাদ বিন হাফিজের ক্রুসেডসমগ্র-(১-৩) ২৭০০ কমিশন বাদে ১৩৫০ টাকা

| জামায়াত সিলেবাস | | শিবির সিলেবাস | |
|---|---|---|---|
| সদস্য (রুকন) হাদীস /সাহিত্য | ৬৮০০/- | সাথী সিলেবাস হাদীস/সাহিত্য | ৩০০০/- |
| স্বল্প শিক্ষত হাদীস /সাহিত্য | ২৫০০/- | সদস্য সাহিত্য ৭৮টি | ১০,৩০০/- |
| কর্মী সিলেবাস হাদীস/সাহিত্য | ১৫০০/- | কর্মী হাদীস/সাহিত্য | ১৫০০/- |
| তাফসীর | | | |
| তাহফীমুল কুরআন (১-১৯) | ২৪৮০/ | শব্দে শব্দে কুরআন (১-১৪) | ৩০০০/- |
| তাফসীর ইবনে কাসির (১-৯) | ৩১০০/- | ফি-যিলালিল কুরআন (১-২২) | ৪০০০/- |

## খন্দকার আবুল খায়ের (র) দারসে কুরআন সিরিজ-১-৫৮টি বই ২০০০/-

# তাক্বিয়া বুক ডিপো

**৫০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০**

০১৭৯১-৭৪৮৮৬৬, ০১৯২৪-৭৩৩৮১৫

Takia book dipo@gmail.com, Fb- Takia book dipo.com

# ইসরায়েলী নৃশংসতা ও গাজার যুদ্ধ

**মীযানুল করীম**

ইসরায়েল গাজায় যত দখলদারি করছে সমগ্র বিশ্বে ক্রমবর্ধমান তা বাধার সম্মুখীন হচ্ছে। ব্রিটেনের এমপিরা সেদেশের প্রধানমন্ত্রীর উপর চাপ সৃষ্টি করেছে ফিলিস্তিনকে রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেয়ার জন্য। ফিনল্যান্ডও একই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কানাডা বলেছে, ইসরায়েল মানবতা বিরোধী অপরাধ করে চলেছে। দেশটি দৈনিক দশ টন মানবিক সাহায্য কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। স্পেনও ফিলিস্তিনকে রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দিতে চায়। ইসরায়েল ক্রমশ বাঁধার মুখে পড়তে যাচ্ছে। ইসরায়েলের বর্বরতার কারণে গাজা ভূ-খণ্ডে ৬১ হাজার ১৮১ জন ফিলিস্তিনি প্রাণ হারিয়েছেন। ত্রাণ প্রার্থীদের কোন নিরাপত্তা নেই। কোন কোন দিন তারা শ'খানিকও প্রাণ হারিয়েছে। এ পর্যন্ত প্রায় ১৫শ প্রাণ হারিয়েছে। এদের মধ্যে নারী এবং শিশুই অধিক। টিভি-তে দেখা যাচ্ছে ত্রাণ প্রার্থীরা ত্রাণের জন্য লাইনে দাঁড়িয়েছে। এমন সময় গুলি চালিয়েছে। এতে অনেকেই নিহত হয়। অনেকে ভয়ে পালিয়ে যায়। ইসরায়েল ত্রাণবাহী জাহাজেও হামলা চালিয়েছে। জাতিসংঘের সামরিক ত্রাণ কর্যক্রম বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।

ফিলিস্তিনির গাজা ভূখণ্ডে চলছে ইসরায়েলি হামলা অন্যদিকে ত্রাণ সরবরাহে বাধা। ইসরায়েলের হামলায় নিহত হয়েছেন ৮৪ জন, আহত হয়েছে দুইশরও বেশি, এটা গত ১৯ জুলাই ভোর থেকে দুপুর সাড়ে ১২টা পর্যন্ত। এদের মধ্যে ৭৩ জন মারা যান আমেরিকা-ইসরায়েল সমর্থিত গাজা হিউম্যানিটারিয়ান ফাউন্ডেশনের (জিএইচএফ) ত্রাণ বিতরণ কেন্দ্রে। আলজাজিরা এ তথ্য জানিয়েছে।

চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, উত্তর গাজার একটি সাহায্য কেন্দ্রের কাছে ইসরায়েলি বাহিনীর গুলিতে ৯ জন নিহত হয়েছেন।

বেসরকারি প্রতিরক্ষা সংস্থার মুখপাত্র মাহমুদ বাসাল বলেছেন, খান ইউনিসের দক্ষিণ-পশ্চিমে এবং রাফার উত্তর-পশ্চিমে ইসরায়েলি বাহিনীর গুলিতে প্রাণ হারান তারা।

অব্যাহত ত্রাণ অবরোধের কারণে মারা যাচ্ছে বিভিন্ন বয়সি শিশু। প্রতি ঘটায় কেন্দ্রীয় হাসপাতালে নেওয়া হচ্ছে অপুষ্টির শিকার শিশুদেরকে।

গাজা শহরের আল-আকসা শহীদ হাসপাতালের সূত্র আলজাজিরাকে জানিয়েছে, অপুষ্টি ও ক্ষুধার কারণে রাজন আবু জাহের নামে চার বছর বয়সি ফিলিস্তিনি শিশু মারা গেছে। গাজা শহরের আল শিফা হাসপাতালের পরিচালক ড. মুহাম্মদ আবু সালমিয়া বলেন,

অপুষ্টি বা অপর্যাপ্ত খাদ্য গ্রহণে ৩৫ দিনের একটি শিশু এবং দেইর আল-বালাহতে চার মাস বয়সি শিশু মারা গেছে।

একদিকে ত্রাণ সরবরাহে অবরোধ। অন্যদিকে সাহায্য কেন্দ্রগুলোতে ইসরায়েলি হামলা, দু'য়ে মিলে গাজায় খাদ্য সংকট তীব্র আকার ধারণ করেছে। গাজা হিউমেনিটারিয়ান ফাউন্ডেশনের (জিএইচএফ) ত্রাণ বিতরণ কেন্দ্রগুলো মৃত্যুফাঁদে পরিণত হয়েছে।

গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় সতর্ক করে দিয়ে বলেছে, হাসপাতালের জরুরি বিভাগে আনা অনাহারী মানুষের সংখ্যা প্রতি মুহূর্তে বাড়ছে। কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, গাজার ১৭ হাজার শিশু গুরুতর অপুষ্টিতে ভুগছে।

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, মে মাসের শেষের দিকে ফাউন্ডেশনটি ত্রাণ বিতরণ শুরুর পর থেকে ইসরায়েলী সেনাদের গুলিতে ৯০০ ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। জাতিসংঘ সংস্থা এবং দাতব্য সংস্থা পরিচালিত ৪০০ কেন্দ্রের পরিবর্তে চারটি পয়েন্ট থেকে খাবার বিতরণ করা হচ্ছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের অজুহাতে এসব হত্যাযজ্ঞ চালাচ্ছে 'জিএইচএফ'।

তবে হত্যাকাণ্ডের ঘটনা অস্বীকার করেছে জিএইচএফ। তাদের দাবি, ত্রাণ কেন্দ্র খোলার আগেই এ ঘটনা ঘটেছে। আইডিএফ-জানিয়েছে, ঘটনাটি পর্যালোচনা করছে তারা।

দেইর আল-বালাহতে নতুন করে বহিষ্কারাদেশ জারি করেছে ইসারায়েলি বাহিনী। বর্তমানে অন্য অঞ্চল থেকে পালিয়ে আসা বাস্তুচ্যুতরা আশ্রয় নিয়েছে এখানে।

গাজা উপত্যকায় ইসরায়েলি গণহত্যার বিরুদ্ধে বিশ্বজুড়ে ক্ষোভ বাড়ছে। দেশটির সাথে সব ধরনের সম্পর্ক ছিন্ন ও ইসরায়েলি কুটনীতিকদের বহিষ্কার করার দাবিতে দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারে উপর চাপ ক্রমেই তীব্র হয়ে উঠছে।

কয়েকজন অধিকারকর্মী বলেছেন, ইসরায়েলের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা ও কুটনীতিকদের বহিষ্কারের দাবিতে তারা তাদের আন্দোলন জোরদার করেছেন।

গাজায় ইসরায়েল যুদ্ধ শুরু করার পর উপত্যকাটিতে দুই লাখের বেশি ফিলিস্তিনি হতাহত হয়েছেন। উপত্যকাজুড়ে দুর্ভিক্ষ শুরু হয়েছে। ইসরায়েলের সাথে সম্পর্ক রাখার বিষয়টিকে 'যুদ্ধে সহায়তার শামিল' হিসেবেই দেখছেন অধিকারকর্মীরা। লেখক ও অধিকারকর্মী জুকিসওয়া ওয়ানার বলেন, দক্ষিণ আফ্রিকার অনেকে ভেবেছিলেন, ২০২৩ সালের শেষ দিকে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক বিচার আদালতে মামলা করার ফলে-এ যুদ্ধের দ্রুত অবসান হবে। কিন্তু পশ্চিমা দেশগুলোর পূর্ণ সমর্থন নিয়ে ইসরায়েল গাজায় যুদ্ধ চালিয়ে গেছে।

ওয়ানার বলেন, 'ব্যক্তিগত ভাবে এ গণহত্যা বন্ধে চাপ দেয়ার ক্ষমতা আমাদের নেই। নাগরিক হিসেবে আমরা আমাদের সরকারের কাছে অন্তত দাবি জানাতে পারি। দক্ষিণ আফ্রিকা অস্বাভাবিক ও গণহত্যাকারী সরকারের সাথে স্বাভাবিক সম্পর্ক রাখতে পারে

না।" গাজায় যুদ্ধ শুরুর পর শুধু বলিভিয়া ও বেলিজ ইসরায়েলের সাথে কুটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করেছে। বাহরাইন, চাদ, সুদান ও তুরস্ক মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এ দেশগুলো বিভিন্ন সময় রাষ্ট্রদূতদের প্রত্যাহার করলেও ইসরায়েলের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক বজায় রেখেছে।

দক্ষিণ আফ্রিকায় ২০১৮ সালের পর থেকে কোনো ইসরায়েলি রাষ্ট্রদূত নেই। সেখানকার অধিকার কর্মীরা বলেছেন, ইসরায়েলের বিরুদ্ধে দক্ষিণ আফ্রিকার পদক্ষেপ নেয়া উচিত। ২০২৩ সালের নভেম্বরে দক্ষিণ আফ্রিকার পার্লামেন্টে ইসরায়েলের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার প্রস্তাব পাস হলেও প্রেসিডেন্ট সিরিল রামাফোসার সরকার এখনো কার্যকর করেনি। এ নিয়ে দেশটির জনগণের মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভ বিরাজ করছে।

ওয়ানার বলেন, 'কিছু দেশ কোনো আড়ম্বর ছাড়াই ইসরায়েলের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে, যা আমরা করতে পারিনি। কয়েক সপ্তাহ আগে দক্ষিণ আফ্রিকার প্যালেস্টাইস সলিডারিটি ক্যাম্পেইন (পিএসসি) নামের সংগঠন এক পিটিশন তৈরি করেছে। এতে ইসরায়েলি দূতাবাস বন্ধের আহ্বান জানানো হয়েছে। পিটিশনে কয়েক হাজার মানুষ স্বাক্ষর করেছেন।

পিটিশনে বলা হয়েছে, 'আপনারা ইসরায়েলের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক বিচার আদালতে গণহত্যা মামলা দায়ের করেছেন; অর্থাৎ আপনারা স্বীকার করেছেন যে, ইসরায়েল গণহত্যা করছে। কিভাবে আমরা সেই গণহত্যাকারী রাষ্ট্রের সাথে কূটনৈতিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক বহাল রাখতে পারি?'

গাজায় ইসরায়েলি যুদ্ধ ও পশ্চিম তীরে নৃশংস দখলদারির বিরুদ্ধে দক্ষিণ আফ্রিকাজুড়ে ছোট ছোট প্রতিবাদ কর্মসূচি হয়েছে।

চলতি কয়েক সপ্তাহ আগে দক্ষিণ আফ্রিকার ডারবানে অধিকারকর্মীরা জড়ো হন। কারণ, খবর পাওয়া যায় যে, জাহাজ দক্ষিণ আফ্রিকা হয়ে ইসরায়েলের উদ্দেশ্যে যাচ্ছে। জাহাজে এমন মালামাল আছে, যা হয়তো গাজা যুদ্ধে ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হতে পারে। অধিকার কর্মীরা দক্ষিণ আফ্রিকার বিডিএস (বর্জন, প্রত্যাহার ও নিষেধাজ্ঞা) জোটের মাধ্যমে আরো জানতে পারে যে, ভারতীয় শহর চেন্নাই থেকে ছেড়ে জাহাজটি 'বিপজ্জনক পণ্য' বহন করছে।

ভারত এর আগে ইসরায়েলে ড্রোন, বিস্ফোরক ও যন্ত্রাংশ পাঠিয়েছে। ডারবানকে আরেকটি গাজা হয়ে ওঠা যা প্রতিরোধে তারা প্রতিশ্রুতি বদ্ধ। খবর পেয়ে শত শত মানুষ অনলাইনে সক্রিয় হন এবং পুলিশ ও জনপ্রতিনিধিদের কাছে জাহাজটিতে তল্লাশি করার দাবি জানায়। পরে পুলিশ জানায়, জাহাজে মানবাধিকার লঙ্ঘনে ব্যবহৃত হওয়ার মতো কিছু পাওয়া যায়নি। স্থানীয় লোকজন এ সাড়া ও সতর্কতার প্রশংসা করেন।

সংযুক্ত আরব আমিরাত (ইউএই) থেকে ইসরায়েল তাদের বেশির ভাগ কুটনেতিক কর্মী ফিরিয়ে আনছে। দেশটির জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিল (এনএসসি) উপসাগরীয়

দেশটিতে ইসরায়েলিদের জন্য ভ্রমণ সতর্কতা হালনাগাদ করায় এ পদক্ষেপ নিয়েছে বলে ইসরায়েলি সংবাদ মাধ্যমগুলো জানিয়েছে। এ সিদ্ধান্ত এমন এক সময় এলো, যখন ইসরায়েল আমিরাতে নিযুক্ত তাদের রাষ্ট্রদূত ইয়োসি আব্রাহাম শেলিকে ফিরিয়ে নিয়েছে।

আমিরাত জানায়, রাজধানী আবুধাবির একটি বারে নারীদের সাথে নিয়ে প্রবেশ করে 'অশোভন আচরণ করায় তারা আর শেলিকে গ্রহণ করতে ইচ্ছুক নয়। ইসরায়েলের জাতীয় নিরাপত্তা পর্ষদ সতর্ক করে দেয় যে, আরব আমিরাতে ইহুদি ও ইসরায়েলিদের উপর হামলার চেষ্টা হতে পারে। বিশেষ করে ইহুদী ধর্মীয় ছুটির সময়ে।

ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকায় ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের ঝুঁকিতে রয়েছেন মানুষ। সেখানে প্রতি তিনজনের মধ্যে একজন মানুষই অভুক্ত। জাতিসংঘের শিশু তহবিল (ইউনিসেফ) এই তথ্য জানিয়েছে। দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে সংস্থাটি।

ইসরায়েল, গাজা ও দখলকৃত পশ্চিম তীর সফর শেষে বিবৃতি দিয়েছেন ইউনিসেফের মানবিক কার্যক্রম ও সরবরাহ পরিচালক বিষয়ক উপনির্বাহী পরিচালক ট্রেড চেইবান। তিনি বলেছেন, ৩ লাখ ২০ হাজারের বেশি শিশু তীব্র অপুষ্টির ঝুঁকিতে। গাজায় অপুষ্টির সূচক দুর্ভিক্ষের সীমা ছাড়িয়ে গেছে।

চেইবান বলেন, 'গাজার শিশুরা সবচেয়ে কষ্টে আছে। সেখানকার শিশুরা নজিরবিহীন হারে মারা যাচ্ছে। যেসব সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে, তা হাজার হাজার শিশুর জীবন মৃত্যুর ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করবে।"

২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর থেকে ইসরায়েলের হামলায় গাজায় ৬২ হাজারের বেশি ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন।

তাদের মধ্যে ১২ হাজারের বেশি শিশু। গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, দুর্ভিক্ষের কারণে এখন পর্যন্ত ১৬২ জনের মৃত্যু হয়েছে, যার মধ্যে ৯২টি শিশু।

হামাসের হাতে বন্দি থাকা জিম্মিদের দ্রুত মুক্তি দেওয়া নিয়ে কোন অগ্রগতি না হলে যুদ্ধ বন্ধ হবে না বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন ইসরায়েলের সেনাপ্রধান।

ইসরায়েলি সেনাপ্রধান লেফটেন্যান্ট জেনারেল এয়াল জামিরকে উদ্ধৃত করে এ তথ্য জানানো হয়েছে। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'আমি অনুমান করছি, কয়েক দিনের মধ্যেই আমরা জানতে পারব জিম্মিদের মুক্তি নিয়ে কোনো সমঝোতায় পৌঁছানো সম্ভব কিনা। তা না হলে বিরতিহীন ভাবে যুদ্ধ চলবে।' গাজায় কর্মকর্তাদের উদ্দেশে বক্তব্যে তিনি এ হুঁশিয়ারি দেন।

গত বিশ মাস ধরে নারী-শিশু নির্বিশেষে উপত্যকাটির মানুষের উপর চলছে বর্বর হত্যাযজ্ঞ। গাজায় যে নারকীয় হত্যাকান্ড চলছে, তা স্বাভাবিক মানুষের পক্ষে হজম করা বেশ কঠিন। এমন হৃদয়বিদারক চিত্র একটি-দুটি নয়, হাজার হাজার। লাখ লাখ মানুষ সেখানে এক অনিশ্চয়তার মধ্যে। যাদের খাদ্য নেই, থাকার জায়গা নেই,

আত্মীয়স্বজনের খোঁজ নেই। এক অমানবিক ও মর্মান্তিক জীবন পার করছেন গাজাবাসী। ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর হামাসের সীমান্ত হামলার প্রতিক্রিয়ায় ইসরায়েলি সেনাবাহিনী হামাসকে নিশ্চিহ্ন করার লক্ষ্যে গাজায় অভিযান শুরু করে। হামাসের হামলায় প্রায় বারশ জন নিহত হয় এবং জিম্মি করা হয় ২৫১ জনকে। গাজায় হামাস পরিচালিত স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, ইসরায়েলি হামলা শুরুর পর থেকে ৬১ হাজার ১৮১ জন প্রাণ হারিয়েছে। মানবিক সহায়তার গতিবিধির উপর ইসরায়েলি বিধিনিষেধ এবং জ্বালানি ঘাটতির কারণে ত্রাণ সংগ্রহ ও বিতরণ করতে হিমশিম খাচ্ছে জাতিসংঘ। জাতিসংঘের এই সংস্থাটি বলছে, মানবিক সহায়তার অভাবে মনুষ মারা যাচ্ছে। অপুষ্টির কারণে নারী ও শিশুর জরুরি চিকিৎসার প্রয়োজন পড়ছে। গত ২১' মাসে হামাসের সঙ্গে যুদ্ধে গাজায় ইসরায়েলের কৌশল নিয়ে নিন্দা জানিয়ে অনেক আন্তর্জাতিক বিবৃতি দিয়েছে।

এই বিবৃতিতে স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে যুক্তরাজ্য এবং আরও ২৭টি দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীরা রয়েছেন। রয়েছেন অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, জাপান, ইতালি, ফ্রান্স, নিউজিল্যান্ড এবং সুইজারল্যান্ড। বিবৃতির শুরুতেই ঘোষণা করা হয়েছে যে, 'গাজায় এখনই যুদ্ধ বন্ধ হওয়া উচিত।' দেশগুলো সর্তক করে বলছে, গাজায় সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ নতুন স্তরে পৌঁছেছে। ইসরায়েল সরকারের ত্রাণ সরবরাহ পদ্ধতি বিপজ্জনক ও অস্থিরতা তৈরি করছে এবং গাজার মানুষদের মানবিক মর্যাদা থেকে বঞ্চিত করছে।' খাদ্য, পানি ও বিদ্যুৎ -এর অভাবে মানুষ মানবেতর জীবন কাটাচ্ছে। চিকিৎসা উপকরণ ও বিদ্যুৎ এর সংকটে চিকিৎসা সেবা বন্ধের উপক্রম। অবরুদ্ধ গাজায় লাখ লাখ বাসিন্দা ভয়াবহ মানবিক সংকটে পড়েছে। গাজার বাসিন্দারা এ পরিস্থিতিকে, একটি ধীর, যন্ত্রণাময় মৃত্যুর প্রক্রিয়া বলে বর্ণনা করেছেন, যা বাস্তবে তাদের সঙ্গে ঘটছে। ইসরায়েল মার্চ থেকে গাজায় কোন পণ্য প্রবেশ করতে দেয়নি। মে থেকে সামান্য পরিমাণে ত্রাণ ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে। এই ত্রাণ ইসরায়েল সমর্থিত মূলত যুক্তরাষ্ট্র ও গাজা হিউম্যানিটারিয়ান ফাউন্ডেশন (জিএইচএফ) বিতরণ করছে। জাতিসংঘ ও অন্যান্য ত্রাণ সহায়তা প্রদানকারী সংগঠনগুলো বলছে, ইসরায়েল গাজায় প্রবেশ ও বহির্গমন নিয়ন্ত্রণ করে। তারা গাজায় ত্রাণ সহায়তা পৌঁছানোর পথ বন্ধ করে রেখেছে। আর ইসরাইয়েলি সেনারা মে থেকে ত্রাণ বিতরণ কেন্দ্র গুলোর কাছে শত শত ফিলিস্তিনিকে গুলি করে হত্যা করেছে।

গাজার জনসংখ্যার অর্ধেক শিশু। ২০২৩ সালের ৩১ অক্টোবর ইউনিসেফের প্রতিবেদন অনুসারে 'গাজা শিশুদের জন্য কবরের মতো, আর অন্যদের জন্য জীবন্ত নরক।' জাতিসংঘের কর্মকর্তারা প্রায় একই সূরে কথা বলেছেন। গাজায় ২১ মাসে ১৭ হাজারের বেশি শিশু মারা গেছে। গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, এর বাইরে অনেক শিশু নিখোঁজ এবং হাজারো শিশু ধ্বংসস্তূপের নিচে। ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর থেকে

ইসরায়েল প্রতিদিন গড়ে ৩০টি শিশুকে হত্যা করেছে। অর্থাৎ প্রতিদিন একটি ক্লাসরুমের শিশু এবং ৪৫ মিনিটে একজন শিশুকে হত্যা করা হয়েছে। ইসরায়েল শিশুদের নিশানা করেই পরিকল্পিতভাবে হামলা করছে। গাজার শিশুরা নিশানা হওয়ার কারণ সেখানকার দশ লাখ শিশু তারুণ্যের দিকে এগোচ্ছে, যা ইসরায়েলি সমাজের জন্য চ্যালেঞ্জ। তাদের লক্ষ হলো, ফিলিস্তিনের সাধারণ বন্ধন ও সামাজিক কাঠামো ধ্বংস করা। গাজার শিশুদের নিশানা করার আরো কারণ হচ্ছে, তারা ঠিক সেই ভবিষ্যতের প্রতিনিধিত্ব করে, যাদের জিনগত জ্ঞান এবং ঐতিহাসিক স্বারক আছে। ফিলিস্তিনে সবচেয়ে বেশি সাক্ষরতার হার রয়েছে।

ফিলিস্তিনের মনুষ্য সমাজ এমন এক মাত্রার ভয়াবহতা সহ্য করতে বাধ্য হয়েছে, যা মানুষকে চিরকাল তাড়িয়ে বেড়াবে। গাজায় শত শত পরিবার নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। যারা এই হামলা থেকে বেঁচে আছে, তারা আজীবন মানসিক বিপর্যয়ের মধ্যে দিয়ে যাবে। এটি আতঙ্কগ্রস্ত প্রজন্মের জন্ম দিবে। তাদের আশপাশের এলাকা সম্পূর্ণ শ্মশানে পরিণত হয়েছে। চারিদিকে মৃতদেহ ও ছিন্ন ভিন্ন দেহাবশেষের দৃশ্য চোখে নিয়ে তাদের জীবন কাটাতে হবে। বিশ্ববাসী এ উপলব্ধি করছে যে, ফিলিস্তিনে নজিরবিহীন ও অমানবিক গণহত্যা চলছে। এই ঘটনা বিশ্বকে প্রান্তিক পর্যায়ে ঠেলে নিয়ে গেছে। ফিলিস্তিনি জনগণের মানবতা পুনরুদ্ধার করা এবং জন্মভূমির অধিকারের স্বীকৃতি দেওয়া অপরিহার্য। অবিলম্বে ফিলিস্তিনে এই গণহত্যা বন্ধ হওয়া উচিত।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নব নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প নিজেকে অনন্য উচ্চতায় নিতে চান। তিনি দেখাতে চান; ইরান-ইসরায়েল সংঘাত এবং গাজার সমস্যার সমাধান তার হাতে। তিনি ক্ষমতায় যাওয়ার প্রাক্কালে গাজার সমস্যার সমাধান করবেন বলে কথা দিয়েছিলেন। কিন্তু খৃস্টান ইউক্রেন রাশিয়ার বিরুদ্ধে তার কথা শুনে নাই, তেমনি ইসরায়েলও তার কথা শুনে নাই। তিনি কিছু করতে পারেননি। উল্টো ইসরায়েল গাজায় গণহত্যা চালাচ্ছে বলে তিনি দীর্ঘশ্বাস ছেড়েছেন। তার যেন আর কিছু করার নাই। গাজায় যুদ্ধ বিরতি ক্ষণ ভঙ্গুর। ইসরায়েলের কট্টরপন্থি প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু গাজা পুরো দখল করতে চায়, কিন্তু তার সেনাবাহিনী তার বিরুদ্ধে। গাজায় যুদ্ধ বন্ধে ৬০০ সাবেক ইসরায়েলি কর্মকর্তা মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ট ট্রাম্পকে চিঠি পাঠিয়েছেন। ট্রাম্প এর কি জবাব দেন, এটা দেখার বিষয়। ট্রাম্প ফিলিস্তিনিদের উপর খড়গহস্ত, এটা সবার কাছে স্পষ্ট। ইসরায়েলের বিরুদ্ধে নিষ্ক্রিয়, এটাও সবার কাছে স্পষ্ট। ■

**প্রশ্ন-১ ঃ আব্দুল আলী সাহেব এক স্ত্রী, ১১ পুত্র ও পাঁচ কন্যা এবং দুই ভাই রেখে মারা যান। তার রেখে যাওয়া সম্পদ শরী'আহ মোতাবেক বন্টন করার নিয়ম জানালে কৃতজ্ঞ থাকবো।**

**আরিফ হোসেন, বি. বাড়িয়া**

**উত্তর ঃ** জনাব আব্দুল আলী সাহেবের সমুদয় সম্পদের ৮ ভাগের ১ ভাগ পাবেন তার স্ত্রী। বাকি সাত ভাগ, এগার পুত্র ও পাঁচ কন্যার মধ্যে প্রত্যেক পুত্র পাবে প্রত্যেক কন্যার দ্বিগুণ হারে বন্টন করতে হবে। আর তার দুই ভাই তার রেখে যাওয়া সম্পদ থেকে বঞ্চিত হবেন অর্থাৎ তারা কিছু পাবেন না।

অতএব স্ত্রীকে ৮ ভাগের ১ ভাগ দেয়ার পর বাকি সাত ভাগকে সমান ২৭ ভাগে ভাগ করে পাঁচ কন্নার প্রত্যেককে একভাগ করে পাঁচ ভাগ দিতে হবে। বাদ বাকি ২২ ভাগ ১১ পুত্রের প্রত্যেককে দুই ভাগ করে।

১১×২=২২ দিতে হবে।

আব্দুল আলী সাহেবের রেখে যাওয়া সমুদয় সম্পদ এভাবে বন্টন করলে তার ওয়ারিশগণের মধ্যে তার সম্পদে শরী'আহ মোতাবেক বন্ধন করা হবে।

**প্রশ্ন-২ ঃ কোন মসজিদের পুরাতন আসবাবপত্র যা উক্ত মসজিদের কাজে লাগে না সেসব আসবাব পত্রের ব্যাপারে শরী'আতের বিধান কি জানতে চাই?**

**কবির হোসেন**
**চান্দিনা**

**উত্তর ঃ** মাসজিদের আসবাবপত্র উক্ত মসজিদের কাজেই ব্যবহার করা চাই। কোন মাসজিদের অতিরিক্ত আসবাবপত্র কিংবা পুরাতন আসবাবপত্র যদি উক্ত মাসজিদের কাজে না লাগে তাহলে পার্শ্ববর্তী কিংবা দূরবর্তী কোন মাসজিদে তা লাগাতে হবে। তাও যদি সম্ভব না হয় তাহলে উক্ত আসবাবপত্র বিক্রি করে সে অর্থ উক্ত মাসজিদে কিংবা অন্য যেকোন মাসজিদে ব্যবহার করতে হবে। এসব আসবাবপত্র যে বা যারা কিনবে তারা নির্দ্বিধায় তাদের যে কোন কাজে তা ব্যবহার করতে পারবে। তাতে পাপ বা অসম্মানের কিছু নেই।

**প্রশ্ন-৩ ঃ তিন তলা বিশিষ্ট একটি মাসজিদের তৃতীয় তলায় কুরআন শিক্ষা দেয়া হয়। সেখানে আবাসিক ও অনাবাসিক উভয় শ্রেণীর ছাত্ররা কুরআন হিফজ করে ও নাজেরা পড়ে। নামাযের সময় বিশেষ করে জুমাবারে তৃতীয় তলাসহ পুরো মাসজিদই মুসল্লিতে ভরে যায়। প্রশ্ন হল- এভাবে মাসজিদে কুরআন শিক্ষা দেয়া এবং মাসজিদে ছাত্রদের থাকা ও অবস্থান করা শরী'আতের দৃষ্টিতে বৈধ কিনা?**

**আবদুল্লাহ আল মামুন, নীলফামারী**

**উত্তর ঃ** মাসজিদ আল্লাহর ঘর। মাসজিদের সম্মান মর্যাদা ও পবিত্রতা রক্ষা করা জরুরি। কুরআন শিক্ষা করা এবং শিক্ষা দেওয়াও নিঃসন্দেহে বিরাট সওয়াব ও মর্যাদা পূর্ণ কাজ। এ

কাজ মাসজিদে করাতে দোষের কিছু নেই বরং এটা মাসজিদের উপযোগী কাজ। তবে মুসল্লীগণের সালাত আদায়ের কোন বিঘ্ন সৃষ্টি না হয় সেদিকে অবশ্যই লক্ষ রাখতে হবে। সেই সাথে এ কথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে, মাসজিদ থাকার জায়গা ও আবাসন নয় এবং মাসজিদকে আবাসন বানানো ঠিক নয়। পড়ার সময় ছাত্ররা মাসজিদে বসে কুরআনুল কারীম পড়লো এবং শোয়া ও ঘুমানো মাসজিদের বাইরে কোথাও করা যায়। মাসজিদকে আবাসন বানানো থেকে বিরত থাকা কর্তব্য।

**প্রশ্ন-৪ ঃ মাসজিদের সামনে মাসজিদ সংলগ্ন ও মাসজিদের চত্তরের সাথে লাগোয়া জনৈক ব্যক্তির একটি খালি জায়গা রয়েছে। অজানা লোকেরা এটাকে মাসজিদের জায়গা বলেই মনে করে। দেখতেও সেরকমই দেখায়। জানাযা আসলে মাসজিদ চত্বর ও ওই জায়গায় জানাযার সালাত আদায় করা হয়। এভাবেই কেটে যায় অনেক দিন। জায়গাটি অঘোষিতভাবে মাসজিদের জায়গার মতই হয়ে গেছে। এই জায়গার মালিক এখন এ জায়গাটাকে নিজের কাজে লাগাতে কিংবা বিক্রি করতে চায়। কিন্তু সে দ্বিধাদ্বন্দ্বে আছে জায়গাটি নিজের কাজে লাগালে কিংবা বিক্রি করলে তার কোন পাপ হবে কিনা?**

**শরিফ হোসাইন**
**নরসিংদী**

**উত্তর ঃ** জায়গাটি এক ব্যক্তির মালিকানাধীন। তিনি যদি এটাকে মাসজিদের নামে অথবা জানাযার সালাত আদায়ের উদ্দেশ্যে লিখিত কিংবা মৌখিকভাবে দান কিংবা ওয়াকফ না করে দিয়ে থাকেন, তাহলে জায়গাটি মাসজিদের পাশে হলেও এবং সেখানে জানাযার সালাত আদায় করা হলেও জায়গাটি উক্ত মালিকের মালিকানাধীনই রয়েছে।

অতএব তিনি এটাকে নিজের কাজে লাগাতে চাইলেও লাগাতে পারেন এবং বিক্রি করতে চাইলেও বিক্রি করতে পারেন তাতে কোন বাধা কিংবা কোন দোষ নেই। তবে জায়গাটি যেহেতু মাসজিদের সাথে লাগোয়া এবং ভবিষ্যতে কখনো মাসজিদ বড় করা হলে এই জায়গার উপরও মাসজিদ বর্ধিত হতে পারে। অতএব তিনি যদি এটাকে মাসজিদের জন্য দান করে দেন তাহলে এটা হবে তার ইহকাল ও পরকালের জন্য বড়ই কল্যাণকর। আর যেহেতু জায়গাটা মাসজিদের জায়গার মতোই হয়ে গেছে সেহেতু এরই মধ্যে হয়তো বড় কল্যাণ নিহিত রয়েছে। মাসজিদের জন্য দান করে তিনি সেই কল্যাণ লাভ করতে পারেন।

**প্রশ্ন-৫ ঃ যেসব হাজী সাহেবগণ হজ করতে যান তাদের উপর কি কুরবানী করা ওয়াজিব?**

**আহসান, ময়নামতি, কুমিল্লা**

**উত্তর ঃ** কুরবানি দুই প্রকার হয়। এক. ঈদের কুরবানি, দুই. হাজ্জের কুরবানি।

এক. সামর্থ্যবান ব্যক্তি যারা কুরবানির দিনগুলিতে নিসাব পরিমাণ অর্থাৎ সাড়ে ৭ ভরি স্বর্ণ অথবা সাড়ে ৫২ ভরি রুপা অথবা প্রয়োজনের অতিরিক্ত সমপরিমাণ অর্থ সম্পদের মালিক হয়, তাদের উপর কোরবানি করা ওয়াজিব।

দুই. হাজ্জের কুরবানি: যেসব হাজী সাহেবগণ হজ্জে তামাত্তু অথবা হাজ্জে কিরান এর এহরাম

বাঁধেন অর্থাৎ যারা তামাত্তু অথবা কিরান হাজ্জ করেন তাদের উপর ওই হাজ্জের কুরবানি করা ওয়াজিব।

হাজী সাহেবগণের উপর দুইটা শর্ত সাপেক্ষে কুরবানি ঈদের কুরবানি ওয়াজিব হবে।

এক. হাজ্জ পালনকারী ব্যক্তি যদি মুকিম হন মুসাফির না হন।

দুই. হজ্জের যাবতীয় জরুরি কাজ আনজাম দেওয়ার পর তার কাছে যদি কুরবানি করার মত টাকা থাকে তবে তার উপর কুরবানি ওয়াজিব হবে অন্যথায় নয়।

**প্রশ্ন-৬ ঃ আমরা জানি নবজাতকের জন্য আকিকা করা সুন্নত। যেকোনো দিন আকীকা করলেই কি সুন্নত আদায় হয়ে যাবে?**

**আবু আসলা**
**মীরপুর, ঢাকা**

**উত্তর ঃ** নবজাতকের আকীদা তার জন্মের সপ্তম দিনে করা সর্বসম্মত মতে সুন্নাত।

এমনকি পিতা অভাবী হলেও। রাসূলুল্লাহ (সা) ও তার সাহাবীগণ এটা করেছেন। সুনান আবু দাউদ, জামি'আত তিরমিজি, সুনান আস নাসাঈ ও ইবনে মাজাহ বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, প্রতিটি শিশু তার আকিকার সাথে বন্ধক থাকে। শিশু জন্মের সপ্তম দিনে তার পক্ষ থেকে যবেহ (আকিকা) করতে হয়, মাথামুণ্ডন করতে হয়।........

(সুনান আবু দাউদ, অধ্যায় কুরবানির নিয়ম কানুন, অনুচ্ছেদ-২১, আকিকার বর্ণনা, হাদিস নং-২৮৩৭)

দারা কুতনীর এক বর্ণনামতে ১৪ তম দিনে আকিকা করা মুস্তাহাব।

ইমাম তিরমিযীর এক বর্ণনামতে, কেউ যদি সপ্তম দিনে এবং ১৪তম দিনে কোন কারণে আকিকা করতে না পারে তবে ২১তম দিনে করা মুস্তাহাব হবে।

সার কথা হল, নবজাতকের জন্য আকিকা করা সুন্নাত। আর এ সুন্নাত সপ্তম দিনে করার মাধ্যমেই আদায় হয়। আর এ দিনে আকিকা করার মাধ্যমে যেমন সুন্নত আদায় হয় তেমনি শিশুটিও অনেক রোগ বালাই, বিপদ-আপদ ও বালামুসিবত থেকেও রক্ষা পায়। অতএব আকিকা গুরুত্বহীন কোন কাজ নয়। আর একটা শিশুর হঠাৎ জন্ম হয় না। মায়ের পেটে সে দশ মাসেরও বেশি সময় থাকে। জন্মের দিনখনও জানা যায়। শিশুটি মায়ের পেটে আসার পর থেকেই যদি তার মা, বাবা ও মুরুব্বীরা গুরুত্ব সহকারে তার আকিকার ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করে তাহলে তারা যত গরীব হোক না কেন যথাসময়ে অর্থাৎ জন্মের সপ্তম দিনেই তার আকিকা করা সম্ভব। ১৪তম, ২১তম কিংবা অন্য কোন সময় ও সুযোগের অপেক্ষা করার দরকার হয় না। সুন্নাত মোতাবেক সপ্তম দিনেই যে কোন ব্যক্তির পক্ষেই সে যত দরিদ্রই হোক না কেন আকিকা করা সম্ভব। আর যদি গুরুত্ব না দেয়া হয়, তাহলে সপ্তম দিনে কেন মাসের পর মাস ও বছর গড়ালেও তাতে কিছু আসবে যাবে না। এমনকি অনেক বরং অধিকাংশ শিশুর ভাগ্যে তো আকিকা জোটেই না।

**প্রশ্ন-৭ ঃ যৌতুকের কারণে বহু পিতা-মাতা ও অভিভাবক তাদের কন্যাদেরকে বিবাহ দিতে হিমশিম খাচ্ছেন। কোন কোন অভিভাবক যৌতুক দিতে না পেরে অবশেষে মেয়ে ওয়ারিশ হিসাবে পিতার সম্পদে যে অংশ পাবে তা বিক্রি করে যৌতুকের দাবি মেটাতে চায়। শরী'আতের দৃষ্টিতে এটা করা কি পিতা-মাতা ও অভিভাবকদের জন্য বৈধ হবে?**

**সফিকুল ইসলাম, বগুড়া**

**উত্তর ঃ** যৌতুক প্রথা আমাদের সমাজের একটা বড় অভিশাপ। এটা সামাজিক ক্যান্সারে পরিণত হয়েছে। এটা সুস্পষ্ট হারাম ও কবীরা গুনাহ। মানুষ এ অভিশপ্ত প্রথা থেকে বাঁচতে চায়। কিন্তু বাঁচার কোন উপায় আছে কি? আমরা বলব, হ্যাঁ আছে। সেটা আর কিছু নয়, সেটা হলো, যে বা যারা যৌতুক দাবি করেন তারা নিজেদের বিবেককে জাগ্রত করুন। আজ যারা যৌতুকের দাবিতে কন্যাদায়গ্রস্থদেরকে বিব্রত করছেন এবং যৌতুকের দাবি পূরণ করার জন্য বিভিন্নভাবে প্রেশার দিচ্ছেন ও কথার বান ছুড়ে তাদের অন্তরকে ক্ষতবিক্ষত করছেন। অপেক্ষা করুন বেশি দিন নয়, আপনার ঘরেও আল্লাহ তা'আলা কন্যা সন্তান দান করবেন। মনে রাখবেন, একটা অতি প্রসিদ্ধ প্রবাদ বাক্য আছে যা কোনদিন খন্ডন হয় না। তাহলো- 'কামা তাদীনু তুদানু' অর্থ-" তুমি যেমন আচরণ করো, তোমার সাথে তেমনি আচরণ করা হবে।"

সন্তান ছেলে হোক বা মেয়ে হোক পিতা-মাতার সম্পদের ওয়ারিশ হয় (ভাগীদার হয়)। সেটা হয় পিতা মাতার মৃত্যুর পর। তাদের জীবদ্দশায় নয়। মেয়ে সন্তানকে বিবাহ দেয়া পিতা-মাতা ও অভিভাবকদের দায়িত্ব ও কর্তব্য। আর সন্তানরা পিতা-মাতার সম্পদের ওয়ারিশ হবে পিতা-মাতার মৃত্যু পর। যৌতুক দিয়ে মেয়েকে বিবাহ দেয়ার কারণে তাকে পিতা মাতার সম্পদ থেকে বঞ্চিত করার কোন সুযোগ নেই। এটা বৈধ হবে না বরং এটা হবে একটা জুলুম। তবে কোনো মেয়ে যদি তার বিবাহে পিতার যৌতুক দেয়ার কারণে কোনো প্রেসার বা চাপ প্রয়োগ করা ছাড়া সেচ্ছায় ও খুশী মনে তার অংশ ছেড়ে দেয় সেটা হবে ভিন্ন কথা।

**প্রশ্ন-৮ ঃ আমার একটা মুদি ও স্টেশনারি বড় দোকান আছে। এতে প্রতিনিয়ত বেচা-কেনা হয়। এই দোকানের মালের যাকাত কিভাবে দিলে যথার্থভাবে যাতাক আদায় হবে?**

**উত্তর ঃ** আপনি যাকাত আদায়ের জন্য বছরে একটা দিন ধার্য করবেন। যেমন- পহেলা রমাযান। এদিন আপনার দোকানে যত মাল থাকে তার মূল্য নির্ধারণ করবেন এবং দোকানের ক্যাশ টাকা নগদ ও বাকি কত আছে হিসাব করবেন। দোকানের ক্যাশে এবং অন্য কোথাও থাকলে সেটাসহ সব মিলে হবে দোকানের ব্যবসার হিসাব। সব মিলে যোগফল যেটা হবে সেই যোগফলের উপর শতকরা ২.৫০ (আড়াই) টাকা হারে যাকাত ধার্য করতে হবে। এটা হবে শুধু আপনার দোকানের ব্যবসার যাকাত। এছাড়া যদি আপনার অন্য কোন ক্যাশ কিংবা অন্য কোন ব্যবসা থাকে তাহলে সেটাকেও এর সাথে যুক্ত করে যাকাতের হিসাব ঠিক করতে হবে।

- ফাতওয়া বিভাগ, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা।

## বই পরিচিতি

মুহাম্মদ খলিলুর রহমান মুমিন

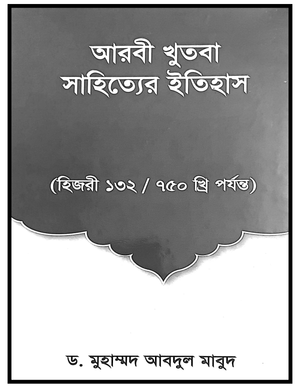


**বইয়ের নাম : আরবী খুতবা সাহিত্যের ইতিহাস**

লেখক : ডঃ মুহাম্মদ আব্দুল মাবুদ

পৃষ্ঠা : ৪৪০

মূল্য : ৪২০ টাকা

প্রকাশক : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা।

খুতবা শব্দটি আরবী। অর্থ-বক্তৃতা, ভাষণ, প্রস্তাবনা ইত্যাদি।

বইটির নামেই বোঝা যায় এটি আরবী বক্ততা বা ভাষণের সাহিত্যিক মূল্যায়ন। বক্তৃতা-ভাষণেও যে সাহিত্য উপাদান রয়েছে তা এ বইতে যুক্তিযুক্ত ভাবে পর্যালোচনা করা হয়েছে। লেখকের ভাষায় নিজেকে ব্যক্ত ও অন্যকে প্রভাবিত করার যত পদ্ধতি ও কলাকৌশল আজ পর্যন্ত মানুষ আয়ত্ব করতে পেরেছে তার মধ্যে খুতবা তথা বক্তৃতা ভাষণ সবচেয়ে প্রাচীন ও সবচেয়ে বেশি কার্যকর পদ্ধতি বলে স্বীকৃত।" (ভূমিকা, পৃষ্ঠ-৫) এ বইতে ইসলামপূর্ব যুগ থেকে হিজরী ১৩২ সন বা ৭৫০ খ্রিস্টাব্দ বা উমাইয়া শাসনামল পর্যন্ত আরবে বিভিন্ন বক্তৃতা-ভাষণের মূল্যায়ন করা হয়েছে।

বইটিতে মোট চারটি অধ্যায় রয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে ১৩টি বিষয়ে আলোচনা রয়েছে। যেমন- খুতবার আভিধানিক ও পারিপার্শ্বিক অর্থ, খুতবা বা বক্তৃতায় আবেগ অনুভূতি, প্রাচীন বিশ্বের বিভিন্ন জাতির বক্তৃতা ভাষণ, গ্রীক ও রোমানদের বক্তৃতা-ভাষণের সাহিত্যিক মূল্যায়ন ইত্যাদি। তাছাড়াও নবী-রাসূলদের বিভিন্ন ভাষণ উদ্ধৃত করে তার সাহিত্যিক মূল্যায়নও করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে জাহিলি যুগের আরব বক্তাদের বক্তৃতা-ভাষণ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। যেমন জাহেলী যুগে বক্তৃতা ভাষণের উপলক্ষগুলো কি ছিল, সে প্রসঙ্গে লেখক নয়টি উপলক্ষ্যের কথা উল্লেখ করেছেন। যথা-পারস্পরিক ঘৃণা-বিদ্বেষ এবং গর্ব-অহংকার প্রকাশ, যুদ্ধের প্রস্তুতিমূলক ভাষণ, অন্তিম উপদেশ, গণক ও গল্পকারদের বক্তৃতা-ভাষণ ইত্যাদি। সেই সাথে জাহিলি যুগের ভাগ্মী বা বক্তৃতাপটু কয়েকজন বক্তার পরিচিতিও তুলে ধরা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে বক্তৃতা ভাষণের ইসলামিকরণ প্রসঙ্গে। খুতবা বা ভাষণের উপলক্ষ ও উদ্দেশ্য কি হওয়া উচিত সে সম্পর্কিত ১২টি পয়েন্ট উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন- দাওয়াতু ইলাল্লাহ, শরীয়তের বিধি-বিধান বর্ণনা, পরামর্শ ও আলোচনা, জিহাদ, আভ্যন্তরীণ গোলযোগ ও বিশৃঙ্খলা, ঐক্য ও সংহতি, ওসিয়ত, বিয়ের খুতবা ইত্যাদি। খুতবা বা বক্তৃতা উন্নয়ন ও বিকাশের কয়েকটি প্রধান কারণ এবং খুতবার সার্বিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জ্ঞানগর্ভ আলোচনা।

চতুর্থ অধ্যায়ে উমাইয়া যুগে খুতবার উন্নতি ও বিকাশ সম্পর্কিত বিস্তারিত আলোচনা। এ যুগে ওয়াজ নসীহত, বাহাস ও মুনাজারা (বিতর্ক) এর বিস্তৃতি ঘটে। সেসব বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা প্রাধান্য পেয়েছে।

বক্তৃতা দেয়ার জন্য বক্তার উঁচু স্থানে দাঁড়ানো, লাঠি, ছড়ি, তলোয়ার কিংবা ধনুকের উপর ভর করে খুতবা দেওয়া, মাথায় পাগড়ি বাধা বা বিশেষ ধরনের পোশাকের ব্যবহার, জাহেলী যুগের খুতবার ভাব ও ভাষা, ইসলামিক যুগে খুতবা সাহিত্যের সার্বিক অবস্থা ইত্যাদি বহু বিষয়ের হৃদয়গ্রাহী আলোচনা এ গ্রন্থে করা হয়েছে। জাহেলী যুগে আরব জনগোষ্ঠী পুরুষ-মহিলা সবাই কাব্য চর্চার সাথে জড়িত ছিল। তাদের স্মরণ শক্তি, মুখস্ত শক্তি, মেধা-মনন ছিল ঈর্ষণীয় পর্যায়ের। ইসলাম উত্তর তারা কাব্য চর্চা জাহেলী যুগের মত ব্যাপক পরিসরে না করলেও অনেকেই কাব্য চর্চায় জড়িত ছিলেন। তাই তাদের কথাবার্তায় বক্তৃতা-ভাষণেও সাহিত্যের উপাদান নিহিত ছিল।

লেখক ডঃ মোহাম্মদ আব্দুল মাবুদ সম্পর্কে পাঠকদের নতুন করে পরিচয় করিয়ে দেয়ার প্রয়োজন নেই। প্রবীণ লেখক, গবেষক দীর্ঘদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেছেন। আরবি বিভাগের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেছেন। ষাটের দশকে সৌদিতে লেখাপড়া শেষ করে দেশে এসে শিক্ষকতা শুরু করেন। তাঁর অনেকগুলো বই পাঠক প্রিয় হয়েছে। তন্মধ্যে আসহাবে রাসূলের জীবন কথা অন্যতম।

আশা করি এই বইটিও পাঠক প্রিয়তা পাবে। প্রচ্ছদ ও বাঁধাই চমৎকার। কলেবর অনুপাতে দামও বেশি নয়। ছাত্র, শিক্ষক, সাধারণ পাঠক সবারই প্রয়োজন এ বইটি। আমি এর বহুল প্রচার কামনা করছি। ■


## দৃষ্টি আকর্ষণ

### মাহে রবিউল আউয়াল উপলক্ষে বিশেষ কমিশনে বই বিক্রয়

সম্মানিত ক্রেতাদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, মাহে রবিউল আউয়াল উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টারের বইগুলো নিজস্ব বিক্রয় কেন্দ্রে পাইকারী ৪২% ও খুঁচরা ৩৫% কমিশনে বিক্রয় করা হবে।

**এই অফার চলবে ২৫ আগস্ট ২০২৫ থেকে ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত**

**ডাক ও কুরিয়ার যোগে বই পাঠানো হয়**

## বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার

**বাংলা বাজার ঃ** ৩৪/১ নর্থ ব্রুক হল রোড, দোকান নং-১৫ (নীচতলা), ঢাকা। ০১৭৪১-৬৭৭৩৯৯

**কাঁটাবন ঃ** কাঁটাবন মসজিদ কমপ্লেক্স, নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা। ০১৬১২-৯৫৩৬৭০, ০১৭৩২-৯৫৩৬৭০

# বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার কর্তৃক প্রকাশিত বই পড়ুন, জ্ঞানকে সমৃদ্ধ করুন।

**পবিত্র মাহে রবিউল আউয়াল উপলক্ষে বিশেষ কমিশনে বই কিনুন**

**এই অফার চলবে ২৫ আগস্ট ২০২৫ থেকে ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত**

**পাইকারী ৪২% এবং খুচরা ৩৫% কমিশনে ক্রয় করুন**

| নং | বইয়ের নাম | লেখক | মূল্য |
|---|---|---|---|
| ১ | দারসুল কুরআন সংকলন-১-২ | এ.কে.এম. নাজির আহমদ | ১৪৫/- |
| ২ | দারসুল কোরআন সিরিজ-১-৩ | প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আবদুস সামাদ | ৪১০/ |
| ৩ | দারসুল হাদীস সিরিজ-১-৩ | ড. মোহাম্মদ শফিউল আলম ভূঁইয়া | ৩৬০/- |
| ৪ | কুরআন অধ্যয়ন সহায়িকা | খুররম মুরাদ | ১৭০/- |
| ৫ | আল কুরআন এক মহাবিস্ময় | ড. মরিস বুকাইলি | ১০০/- |
| ৬ | সাহীহ্ আল্ বুখারী ১-৫ | ইমাম বুখারী (রহ) | ২৭৭০/- |
| ৭ | সহীহ মুসলিম ১-৮ | ইমাম মুসলিম (র) | ৪১২০/ |
| ৮ | জামে আত-তিরমিযী ১-৬ | ইমাম তিরমিযী (র) | ২৩৯০/- |
| ৯ | সুনান আবু দাউদ ১-৬ | ইমাম আবূ দাউদ (র) | ২২৮০/- |
| ১০ | সুনান আন-নাসাঈ ১-৬ | ইমাম নাসাঈ (র) | ২২৬০/- |
| ১১ | মুসনাদে আহমাদ (১) | ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (র) | ৩৫০/ |
| ১২ | রিয়াদুস সালেহীন ১-৪ | ইমাম মুহিউদ্দীন ইয়াহইয়া আন-নববী (র) | ১৩৩০/- |
| ১৩ | শু'আবুল ঈমান | ইমাম বাইহাকী (র) | ১২০/- |
| ১৪ | সীরাতে ইবনে হিশাম | আকরাম ফারুক অনূদিত | ৪৫০/- |
| ১৫ | আবু বাকর আছ্ছিদ্দিক (রা) | ড. আহমদ আলী | ৭৫০/- |
| ১৬ | উসমান ইবনু আফ্ফান (রা) | ড. যুবাইর মুহাম্মাদ এহসানুল হক | ৩৫০/- |
| ১৭ | আসহাবে রাসূলের জীবনকথা ১-৭ | ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ | ২৩৪০/- |
| ১৮ | তাবি'ঈদের জীবনকথা ১-৪ | ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ | ১১২০/- |
| ১৯ | ইসলামী জাগরণের তিন পথিকৃৎ | এ.কে.এম. নাজির আহমদ | ১৮০/- |
| ২০ | ইসলামী অর্থব্যবস্থার মৌলিক ধারণা | ড. মো: ছামিউল হক ফারুকী | ১৬০/- |
| ২১ | কবিরা গুনাহ | ইমাম আয যাহাবী (র) | ১৮০/- |
| ২২ | আমরা সেই সে জাতি (১-৩) | আবুল আসাদ | ৩৯০/- |
| ২৩ | বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস | আব্বাস আলী খান | ৪২০/- |
| ২৪ | আল আকসা মসজিদের ইতিকথা | এ এন এম সিরাজুল ইসলাম | ৮০/- |
| ২৫ | উসমানী খিলাফাতের ইতিকথা | এ.কে.এম. নাজির আহমদ | ৭৫/- |
| ২৬ | মুসলিম নারীর হিজাব ও সালাতে তার পোষাক | শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়াহ (র) | ৬০/- |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ২৭ | ইসলাম ও পাশ্চাত্য সমাজে নারী | ড. মুসতাফা আস্ সিবায়ী | ১৪০/- |
| ২৮ | নারী অধিকার পর্দা ও নারী পুরুষে মুসাফাহা | ড. মো: ছামিউল হক ফারুকী | ১০০/- |
| ২৯ | পর্দার আসল রূপ | এ.কে.এম. নাজির আহমদ | ৩০/- |
| ৩০ | দি সোর্ড অব আল্লাহ | লে. জেনারেল এ.আই. আকরাম (অব.) | ৩৫০/- |
| ৩১ | দৈনন্দিন জীবনে তাকওয়া | ড. মুহাম্মাদ ছাইদুল হক | ১৪০/- |
| ৩২ | মদিনা মুনাওয়ারার ইতিকথা | এ. এন. এম. সিরাজুল ইসলাম | ২০০/- |
| ৩৩ | মক্কা মুনাওয়ারার ইতিকথা | এ. এন. এম. সিরাজুল ইসলাম | ৬০০/- |
| ৩৪ | ইবনুল কায়্যিম (রহ) | ড. মো: ছামিউল হক ফারুকী | ৪৪০/- |
| ৩৫ | আদর্শ মানব মুহাম্মাদ (সা) | এ. কে. এম. নাজির আহমদ | ৭০/- |
| ৩৬ | আল্লাহর দিকে আহ্বান | এ. কে. এম. নাজির আহমদ | ৪০/- |
| ৩৭ | ইসলামী নেতৃত্ব | এ. কে. এম. নাজির আহমদ | ৬০/- |
| ৩৮ | রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পঠিত দু'আ | ইমাম ইবনে কাইয়েম (র) | ১৩০/- |
| ৩৯ | ইসলামী ব্যাংকিং : বৈশিষ্ট ও কর্মপদ্ধতি | শাহ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান | ৬০/- |
| ৪০ | সুদ | শাহ মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান | ৬০/- |
| ৪১ | আপনাদের প্রশ্নের জওয়াব (১-৩) | আল্লামা ইউসুফ লুধিয়ানাবী (র) | ৪২০/- |
| ৪২ | আল্লাহর পরিচয় | এ.কে.এম. নাজির আহমদ | ৩০/- |
| ৪৩ | সফল জীবনের পরিচয় | এ.কে.এম. নাজির আহমদ | ৭০/- |
| ৪৪ | রাসূলুল্লাহর শিক্ষাদান পদ্ধতি | ড. মুহাম্মাদ আবদুল মাবুদ | ৪০০/- |
| ৪৫ | ইসলামের দৃষ্টিতে পোষাক পর্দা ও সাজসজ্জা | ড. আহমদ আলী | ৩০০/- |
| ৪৬ | তাযকিয়াতুন নাফস | ড. আহমদ আলী | ৩০০/- |
| ৪৭ | ইসলামের শাস্তি আইন | ড. আহমদ আলী | ২২০/- |
| ৪৮ | ইসলামের দৃষ্টিতে সমাজ সেবা ও সংস্কার | ড. মো: ছামিউল হক ফারুকী | ২২০/- |
| ৪৯ | মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য | অধ্যাপক মাযহারুল ইসলাম | ৩৫/- |
| ৫০ | আল্লাহর হক মানুষের হক | জাবেদ মুহাম্মাদ | ২৫০/- |
| ৫১ | ইলমুল ফিকহ ঃ সূচনা ও ক্রমবিকাশ | ড. মুহাম্মদ ছাইদুল হক | ৪০০/- |
| ৫২ | ইমাম বুখারী (রহ.) জীবনি ও হাদীস চর্চা | ড. মোহাম্মদ বেলাল হোসেন | ৪০০/- |
| ৫৩ | নামায কায়েম কর | অধ্যাপক মোশাররফ হোসাইন | ৩০/- |
| ৫৪ | রোযার তাৎপর্য ও বিধিবিধান | ড. মো: ছামিউল হক ফারুকী | ১১০/- |
| ৫৫ | গবেষণাপত্র সংকলন (১-২৫) | সংকলিত | ২১৯৫/- |
| ৫৬ | যুগে যুগে ইসলামী আন্দোলন | এ.কে.এম. নাজির আহমদ | ৬০/- |
| ৫৭ | ইসলামী অর্থ ব্যবস্থায় যাকাত | জাবেদ মুহাম্মাদ | ২৬০/- |

**যোগাযোগ :** ৩৪/১ নর্থ ব্রুক হল রোড, মাদরাসা মার্কেট, (নীচতলা)
বাংলা বাজার, ঢাকা-১১০০। মোবাইল : ০১৭৪১ ৬৭৭৩৯৯
কাঁটাবন মসজিদ কমপ্লেক্স, নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা। মোবাইল : ০১৬১২-৯৫৩৬৭০, ০১৭৩২-৯৫৩৬৭০
E-mail : dhakabic@gmail.com, web : www.dhakabic.com